সেরা গল্প

সেরা গল্প

লিপি মনোয়ার

সেরা গল্প
লিপি মনোয়ার
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: নাজমুল ভূঁইয়া
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৭-৪
ISBN: 978-984-97987-7-4

Sera Golpo by Lipi Monowar, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 350/- (Three Hundred and Fifty Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু
অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন স্যার।

মুখবন্ধ

কথা সাহিত্য রচনার উল্লেখযোগ্য প্রায় প্রতিটি অঙ্গনে সদর্প বিচরণে অভ্যস্ত লিপি মনোয়ার তাঁর গল্পে মানব অভিজ্ঞতার রূপরেখা আঁকেন, যেখানে তিনি মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেন কবির ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাস্তববাদীর অকুণ্ঠ হৃদয় নিয়ে। কবির মতো মানুষের আকাঙ্ক্ষা, নিঃসঙ্গতা, ভাঙনের বেদনাকে নিজের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উপলব্ধি করেন তাদের আবেগের গভীরে তলিয়ে গিয়ে। বাস্তববাদীর মতো জীবনের কঠোর সত্যকে স্পর্শ করেন সূক্ষ্ম চিরন্তন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায়। প্রেমের পুষ্পোদ্যানে ফুল ফোটে ও ম্লান হয়ে যায়, শোকের ছায়ায় সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিত কোণে। প্রেমের উন্মাদনা, আলিঙ্গন ও হারানোর তিক্ততা, বিরহের ক্ষত, আনন্দের ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস ও হতাশার শীতল আঁচল- এই সবই জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে, একটি সুন্দর কাব্যে রূপান্তরিত হয় বিপর্যয়ের মুখেও জীবনের স্রোতে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা মানব মনের নিঃশব্দ অথচ অদম্য প্রতিরোধ ক্ষমতা। জীবনযন্ত্রণার তীব্র অনুভব থেকে অস্থির মুহূর্তের নাজুক সৌন্দর্য পর্যন্ত, প্রতিটি ছায়াকে, প্রতিটি অনুভূতিকে যেন প্রজাপতির ডানার মতো সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতরতায় তুলে ধরেন তিনি। বিশটি গল্পের বিচিত্র সমাহার তাঁর এই গল্প সংকলনটি একই বার্তা বহন করে।

একজন অসাধারণ গল্পকার লিপি মনোয়ার-এর প্রতিটি গল্পের পাতায় ফুটে উঠেছে কালের ক্ষণস্থায়ীত্বের মধ্যে জীবনের নানা রঙে আঁকা অনন্তের ছোঁয়া। প্রায়শ উপেক্ষিত দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম ছায়াপাত, বিপর্যয়ের মুখেও জীবনের অবিরাম প্রবাহ, অস্তিত্বের অন্বেষণের নীরব যাত্রা- সব মিলে গড়ে উঠেছে এক অসাধারণ সৃষ্টি যেখানে প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি কাহিনি, মানবমনের অন্ধকার গহীন থেকে উঠে আসা এক একটি অন্তহীন জ্যোৎস্নার প্রহর যেন। গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়, জীবন এক অসীম সমুদ্র, যেখানে কখনো আমরা উচ্ছ্বাসে ভাসি, কখনো বা বিষাদে ডুবে যাই। ভাসতে ভাসতে, ডুবতে ডুবতে আমরা নিজেদেরই আবিষ্কার করি, খুঁজে পাই।

শুদ্ধতম বিনোদনের জন্যই শুধু নয়, মানবিক অনুভূতির সমগ্র বর্ণালী অনুভব করার জন্য এবং দৈনন্দিন জীবনের গহীনে লুকিয়ে থাকা গভীর সত্যগুলো আবিষ্কার করার জন্য কল্পনা আর বাস্তবের অদ্ভুত মিশেলে গড়া লিপি মনোয়ার-এর এই গল্পের ডালি পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে এক অনন্য আহ্বান ও আন্তরিক আমন্ত্রণ নিয়ে।

স্বপন নাথ
অনুবাদক ও সাহিত্য সমালোচক

সূচি

তুঁহু মম শ্যাম সমান ❑ ১১
নৈশ প্রহরী ❑ ১৭
নাইট গার্ড ❑ ২৩
কোজাগরী ❑ ২৭
জননী বলে শুধু ডাকিব ❑ ৪০
শৈলজা সুন্দরী ❑ ৪৬
শাওন ধরাতলে ❑ ৫০
কাপালী ❑ ৫৯
অন্তরে বাহিরে ❑ ৬৩
অপেক্ষা ❑ ৬৯
ইলিশ ❑ ৭৫
গায়েন ❑ ৮০
জনক ❑ ৮৩
মুক্ত পৃথিবীর পানে ❑ ৮৯
নীলাকাশে নীলাদ্রী ❑ ৯২
সেইতো আবার ❑ ৯৫
একলা আকাশ ❑ ১০৮
তুমি রবে নীরবে ❑ ১১২
কোহিনুর ❑ ১২১
জননী ❑ ১২৫

তুঁহু মম শ্যাম সমান

মির্জা জমসেদ আলী অর্থসম্পদে-বিত্ত বৈভবে টইটম্বুর। এ জীবনে যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। পৃথিবীতে টাকা থাকলে সব অসম্ভবই হার মানতে বাধ্য। সে কথা তিনি যেমন জানেন তেমনি জানে তার চারপাশের সবাই। তিনি যখন যা ইচ্ছা পোষণ করেন তাই পূরণ করে থাকেন। কিছুদিন ধরে একটা ভাবনা মারাত্মকভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার যে পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত আছে তা দু'হাতে খরচ করলেও কয়েক জেনারেশন পার করে যেতে পারবে। কিন্তু মির্জা সাহেব ভাবেন অন্যকথা। তাঁর জীবনতো একটাই। এত অর্থসম্পত্তির কতটুকু অংশই বা তিনি ভোগ করতে পারবেন। এই একজীবনে তা সম্ভব নয়। আর তিনি যদি নিজেই না ভোগ করতে পারেন তাহলে কেন মিছে এই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন? ইদানিং এ চিন্তাই তাকে তাড়িত করছে অহোরাত্র। এ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। তাই আজকাল ব্যবসা বাণিজ্য সভা সমিতি সব ছেড়ে দিয়েছেন। কোন কাজে মন বসাতে পারছেন না। খাওয়া দাওয়াও তেমন করেন না।

মির্জা জমসেদ আলীর পি এ তাপসী খুবই বুদ্ধিমতি ও স্মার্ট-মেয়ে। তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা স্বয়ং মির্জাসাহেবও করে থাকেন। তিনি তাপসীকে ডেকে পাঠালেন। তার কাছে জানতে চাইলেন এ সমস্যার সমাধান কীভাবে বের করা যায় ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে।

তাপসী সাথে সাথেই বললো-'স্যার এ নিয়ে আমাদের চিন্তার কি আছে? এ দেশে আছে কত জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞ অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণির লোক। এরা সবাই আপনার

পরিচিত ও বন্ধুজন। আপনাকে সমীহ করে। এ কাজটা তাদের উপর ছেড়ে দিন স্যার।'

তাপসীর পরামর্শে প্রথমে সভা ডাকা হলো। সে সভায় সবাই একবিষয়ে একমত হলেন যে মির্জা সাহেব যদি নিজেই তার সব অর্থসম্পত্তি ভোগ করে যেতে চান তবে তাকে দীর্ঘায়ু হতে হবে। অথচ মানুষ বাঁচেই বা কত বছর? মৃত্যু যে অমোঘ অনিবার্য। যেকোন সময়ে এসে উপস্থিত হয়ে কোন সময় না দিয়েই নিয়ে যাবে 'না ফেরার দেশে'। মানুষের এই 'সেকেন্ড জার্নি' (দ্বিতীয় যাত্রা) কে পারবে রুখতে?

মির্জা সাহেবের একান্ত অনুগতরা চিন্তিত। তাদের নিজের জীবনে যাই ঘটুক কিন্তু মির্জা সাহেবের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ঘটানো যায় কীভাবে? আর সেটা সম্ভবই বা কীভাবে? সিদ্ধান্ত হলো গোলটেবিল বৈঠক বসাতে হবে। সেখানে দেশের সবশ্রেণির লোকেদের প্রতিনিধিরা আসবেন। মুক্ত আলোচনা হবে। তাঁরা তাঁদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবেন। তাই করা হলো। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী সবশ্রেণির বিশেষজ্ঞরা বসেছেন এ সমস্যার সমাধান করতে। তাদের আর কোন কাজ নেই। সবাইকে মির্জা সাহেব তাদের মাসিক আয়ের পাচঁগুণ অর্থ প্রদান করবেন। সমাধান একটা বের করতেই হবে। দিনের পর দিন চলে আলোচনা পর্যালোচনা।

অনুগতের একজন এ সভায় একবৃদ্ধকে ধরে নিয়ে এলো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বৃদ্ধকে বললো, 'আপনাকেও থাকতে হবে এ বৈঠকে। শুনেছি আপনি বৈজ্ঞানিক। বেতন ভাতা সবই পাবেন আশাতীত ভাবে'। এদিকে বৈঠক চলছে আর চলছে। বৃদ্ধ শুধু ঝিমুচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। নানাজনের নানা মত প্রকাশ করছেন।

জ্ঞানী ডাক্তার বললেন, 'সাধারণত মৃত্যু হয় কোন না কোন রোগের কারণে। তাই শরীরে যাতে কোন রোগ বাসা না বাঁধতে পারে তার জন্য নিয়মিত চেকআপে থাকতে হবে'।

ব্যবসায়ী বললেন, 'ডাক্তারকে রোগ চিহ্নিত করতে করতে যাতে সময় বিনষ্ট না হয় তাই নিজ বাসায় ডায়গোনস্টিক সেন্টার বসিয়ে দিবেন। প্রতিদিন সকালে মলমূত্র কফ রক্ত সব পরীক্ষা করবেন। বলাতো যায় না কখন কোথায় লুকিয়ে বাসা বাঁধে মারাত্মক রোগের জীবাণু।'

কবি বললেন, 'প্রতিদিন কবিতা পড়তে। কবিতা পড়লে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে হৃদয় বা হার্ট ভালো থাকবে।'

সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান খুঁজে চলছে কিন্তু কোনটাই মনঃপূত হচ্ছে না বা সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হচ্ছে না।

আর এ প্রসঙ্গে তাপসী আরো একটা পয়েন্ট যোগ করলো। স্যার শুধু বেঁচে থাকলেই তো হবে না। বৃদ্ধকালে অনেকে বেঁচে থাকেন না বাঁচার মত। তখন সব অর্থ নিরর্থ হয়ে যায়। যা কিছু করার এখনই করুন অর্থাৎ আপনাকে যৌবনকালটাই বাড়াতে হবে। সবাই তার বুদ্ধির তারিফ আবারো করলো। কিন্তু তারই বা কি সমাধান? এবার সবাই বৃদ্ধকে বললো কিছু বলতে। বৃদ্ধ বললো,'আমার মনে হয় ওই বালিকার কথাটাই ঠিক। এমন কিছু করুন আপনার বয়স আর যেন না বাড়ে। এই

আমার মত বুড়া না হয়ে যান। অর্থ যতই থাকুক বয়সের ভারে ভোগবিলাসতো দূরের কথা, জীবন চলাই যে কঠিন।' সবাই বললো, 'লেকচার নয় সমাধান দিন।' তিনি বললেন 'আমি বৈজ্ঞানিক মানুষ, সারা জীবন গবেষণার আলোকে সমাধান খুঁজেছি। এখনও তাই খুঁজি। আমরা একটা গবেষণা আমেরিকায় করেছিলাম দুই জমজ বোনকে নিয়ে। জন্মের পর একবোন বাস করতো একতলায় অপরজন বিশ তলায়। বিশ বছর পর দেখা গেল যে একতলায় বসবাসকারী বোনটি বুড়িয়ে গেছে বিশ তলায় বাস করা বোনের তুলনায়। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হই মানুষের বয়োঃবৃদ্ধি বা বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য সময় শুধু দায়ী নয়। মানুষের শরীরের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও দায়ী। আপনি যদি মহাকাশে দীর্ঘ সময় থাকেন তাহলে আপনার বয়স বাড়া ঐ সময়টুকুতে স্থগিত থাকতে পারে। আপনার তো অর্থের অভাব নেই। আপনি যদি চান আমি মহাকাশে আপনার একশত বছর বেড়ানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আপনি মহাকাশ ভ্রমণ শেষ করে পৃথিবীতে আসবেন একই বয়স নিয়ে। আপনার একশত বছর আয়ুও বেড়ে গেল।' সবাই বৃদ্ধের কথায় চমকিত হয়ে বাহবা দিতে লাগলো। বললো, 'আপনি বিজ্ঞানীমানুষ, আপনিই ব্যবস্থা করুন। টাকা পয়সারতো কোন সমস্যা নাই।'

সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী মহাকাশ যাত্রার সবরকম প্রস্তুতি শেষ। একশত বছরের জ্বালানী কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যানযন্ত্রে ঢুকিয়ে মহাকাশে একশত বছর প্রদক্ষিণের প্রোগ্রাম দেওয়া হলো। যাবার সময় মির্জা সাহেব তার সুন্দরী প্রিয়তমা স্ত্রীকে বললেন তার সফর সঙ্গী হতে। কিন্তু স্ত্রী জানালেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। কয়েকমাস পরেই যে তার কোলে আসবে শিশু। একশত বছর মহাকাশে কাটানো সম্ভব নয়। অবশেষে মির্জা একাই রওনা হলেন মহাকাশের পথে। ক্ষুদ্র পৃথিবীকে ছেড়ে বিশাল মহাকাশে ছুটে চলছেন আর চলছেন। হাজার তারার সাথী হতে যাচ্ছেন। কিন্তু ছুটতে ছুটতে কয়েকদিন পর পুরো পথটাই তার কাছে একরকম লাগছে। দিনরাতের প্রভেদটা বুঝতে পারছেন না। এখানে সূর্যোদয় নেই সূর্যাস্তও নেই। সকাল নেই বিকেল নেই। কেমন একঘেঁয়েমী অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলেন। তখন ঠিক করলেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাবেন। সুইচ টিপলেন মহাকাশ যানটি পৃথিবীতে ব্যাক করাবেন কিন্তু কম্পিউটার জানালো তার ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবী থেকে একশত বছর মহাকাশ চলার প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে স্টার্ট দিয়েছে। এখন স্টপ করতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।' কি আর করা! এভাবেই কেটে গেল একশত বছর!

মহাকাশে একশত বছর পার করে এবার দারুণ উত্তেজনায় ভুগছেন তিনি। পৃথিবীতে আসছেন তিনি। এবার তার নিঃসঙ্গতা-একাকিত্ব ঘুচবে। মহাকাশ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনার জন্য বন্ধু-বান্ধব নিশ্চয় তাকে ঘিরে থাকবে। তার প্রিয়তমা স্ত্রী, বন্ধু আত্মীয়স্বজনদের দেখা পাবেন, হাসি আনন্দে মুখর হবে দিনগুলো আবার আগের মত।

মহাকাশ থেকে দেখেন আহা, সেই মায়াবী নীল পৃথিবী! ক্রমেই দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছে আসছে। যানটি মাটির কাছাকাছি আসতেই তা কেমন সুন্দর সবুজ দেখাচ্ছে। এবার সত্যিই যানযন্ত্রটি একশ বছর মহাকাশ প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর মাটিতে থামলো। মির্জা সাহেব নামলেন। ঠিক তার নিজের দেশের মাটিতেই। যেভাবে কম্পিউটারে নিদের্শ দেওয়া ছিল। ভুলে গিয়েছেন তার বয়সের কথা। তিনি ছুটলেন প্রিয়তমা স্ত্রী ও

স্বজনদের কাছে যাবার জন্য। কিন্তু একশত বছরে তার চেহারা একইরকম থাকলেও পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। বাংলাদেশের উপর ভূমিকম্প, সুনামী ঝড় বন্যা বইতে বইতে এর চেহারাও অন্যরকম। পদ্মা মেঘনা যমুনা স্রোতস্বিনী নদীগুলো আর বইছে না তেমন আগের মত। শুধু তার ক্ষীণরেখা কালের সাক্ষী হয়ে আছে। কোথায় তার ঘর কোথায় তার স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। পৃথিবীর মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেছে। সবাই ছুটছে আর ছুটছে। খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে একটি পার্কে তিনি গিয়ে বসলেন। একটি বালক পার্কে বসে নিজের বানানো প্লেনঘুড়ি উড়াচ্ছিল। তিনি বাচ্চাটির সাথে কথা বলতে চাইছেন কিন্তু দীর্ঘদিনের কথা বলার অচর্চায় ভুলে গেছেন ভাষা। ছেলেটি কাছে এসে বললো, 'আর ইউ মিসিং সামথিং?' গলার আওয়াজ বের হতে চাইছে না মির্জা সাহেবের। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় ছেলেটি বললো, 'তুমি কি কিছু খুঁজছো?' বালকটি বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। মির্জাসাহেব এবার বাক্ ফিরে পেলেন। বললেন 'হ্যাঁ, আমার দেশ বাংলাদেশকে।' সে বললো, 'দিস ইজ বাংলাদেশ।' তিনি ভাবছেন তবে কেন সব অচেনা লাগছে আমি কিছুই চিনতে পারছি না?' হঠাৎ মনেহলো সে নিজের চেহারাটা দেখবে। বালকটিকে বললো 'আমাকে একটা আয়না দেবে? আয়না মিন লুকিং গ্লাস?' তখন বালকটি বললো, 'ওকে, কাম উইথ মি।' বালকটি তাকে বাসায় নিয়ে এলো। বালকটির বাসায় এসে আয়নায় নিজেকে দেখলো ঠিক আগের মতই আছেন তিনি একশত বছর পরেও। কিন্তু কোথায় এখন তার ঘর-বাড়ি আত্মীয়-স্বজন কিছুইতো খুঁজে পাচ্ছেন না। যাদের জন্য কাতর ছিলেন মহাকাশে। তাদের কোন খবর নাই। এতদিন পর এই প্রথম তিনি ক্ষুধা অনুভব করলেন। প্রচণ্ড ক্ষুধা। বহুদিন পর তার দু'মুঠো ভাত খেতে ইচ্ছে হলো। ছেলেটিকে বললেন, 'আমি ক্ষুধার্ত তোমার বাসায় কিছু রান্না আছে?' ছেলেটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 'হোয়াট রান্না বাসায়? রান্নাতো হয় হোটেল রেস্টুরেন্টে।' 'তাহলে তোমরা খাওনা? হ্যাঁ যখন যা খেতে ইচ্ছে করে ওর্ডার দিলেই সে খাবার পৌঁছে দেয়। তুমি কি খাবে বলো আমি অর্ডার দিচ্ছি'। 'আমার ভাত খেতে ইচ্ছে করছে'। আরো অবাক হয়ে ছেলেটি বলল, 'ভাত কি জিনিস?' মির্জাসাহেব বললেন, 'ভাত মানে ভাত'। 'ভাত' এ শব্দটিতো কখনো শুনিনি। দাঁড়াও দেখছি। আমি ডিকশনারি নিয়ে দেখছি।' ছেলেটি ডিকশনারি খুলে অনেক খুঁজে পড়ে বললো,'আই গট ইট, ভাত ইজ আ ওয়ান কাইন্ড অফ বয়েল্ড রাইস। মেনি ইয়ার্স অ্যাগো ইট ওয়াজ আ মেইন ফুড অফ দ্য বেঙ্গলি।' মির্জা বললেন 'তুমি কি বাঙালি নও?' 'ইয়েস বাঙালি, বাট উই আর নট হ্যাবিচুয়েটেড নাও ইন দিস কাইন্ড অফ ফুড।' 'তোমরা ঘরে এখন কি রান্না করে খাও ?' ছেলেটি অবাক হয়ে বললো, 'ঘরে কেউ কি রান্না করে? তোমরা রান্না করো না, ভাত খাওয়া ভুলে গেছ। তাহলে তোমরা কি খাও?'

ওহ ম্যান, মেনি ইয়ারস অ্যাগো মানুষ মানে আদিম মানুষ তো কাঁচা মাংসও খেত। বাট সিভিলাইজড মানুষ কি এগুলো খায়?' মির্জা সাহেব ঝাঁকুনি খেলেন একটু সন্দেহ হলো নিজেকে। তিনি এখন এ বালকের যুগে আনসিভিলাইজড হয়ে যাননি তো? জামানা অনেক এগিয়ে গেছে। ভাত খাওয়ার যুগ পার হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তোমরা যা খাও-তাই খাবো। বড্ড

ক্ষিদে।' ছেলেটি এবার বললো, সুইজারল্যান্ডের লেকের ফিস ফ্রাই আর আমেরিকা থেকে লাঞ্চ প্যাকেট পাঠাতে বলি?' 'আমার যে খুব ক্ষিদে। কবে আসবে এ খাবার? আমি এখনই খাবো।' ছেলেটি তার হাতের ঘড়ির মাধ্যে বাটন টিপলো সুইস টিপে অর্ডার দিলো। বাসায় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজায় খাবার নিয়ে উপস্থিত। সুপার কম্পিউটারের যুগ বলে এতদ্রুত সম্ভব হলো। তিনি বুঝলেন পৃথিবী বহুদূর এগিয়ে গেছে।

ক্ষুধা নিবারণ করে তিনি একা একা হাঁটলেন বহু জায়গায়। বহুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন। পুরানো নামকরা বন্ধু-বান্ধবের কথা । কেউ তাদের চিনে না। কোথায় তার ডাক্তারবন্ধু ব্যবসায়ীবন্ধুরা। কারো কোন হদিস পেলেন না। ঘুরে ফিরে আবার ছেলেটির বাসায় আসলেন। ওকেই এখন সবচেয়ে আপন মনে হচ্ছে।

ছেলেটির বাসায় একটি খুনখুনে বুড়োলোককে দেখতে পেলেন। লোকটি ছেলেটার গ্রান্ড'পা। এই অত্যাধুনিক যুগে তিনি হাঁটেন বিশেষ কায়দায়। জুতার সাথে মেশিন ফিট করা আছে। হাতের রিমোট দিয়ে ডান বাম কন্ট্রোল করছেন। মির্জা ভাবলেন এইলোকটি হয়তো তাকে কোন খোঁজ-খবর দিতে পারবেন। মির্জাসাহেব লোকটির কাছে যাদের কথা জানতে চাইলেন তারা বহুদিন আগেই মারা গেছেন। হঠাৎ একসময় বাসার দেয়ালে টানানো কিছু পুরানো ছবির দিকে মির্জাসাহেবের চোখ পড়লো। দেখে বিশ্বাসই হচ্ছে না। চোখ নিবিষ্ট হলো ছবিগুলোর দিকে। এ ছবিগুলোর মধ্যে তার নিজের ও বাপ-দাদার ছবি দেখতে পেলেন। এবার নিবিড়ভাবে তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধকে। সত্যিই এইলোকটির সাথে মির্জাসাহেবের নিজেরও চেহারার মিল রয়েছে। বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছবির মানুষগুলো কারা?' বৃদ্ধ বললো, 'এরা আমার পূর্বপুরুষ।'

তখন মির্জাসাহেব চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মির্জা জমসেদ আলীকে চিনেন?' 'দেখিনি কখনো শুনেছি তার নাম। আমি তার বংশধর'। আবেগে উত্তেজনায় তিনি গদগদ হয়ে বললেন, 'আমিই সেই ব্যক্তি। মির্জা জমসেদ আলী। এইবাড়ি-ঘর এবং তোমরা,সবই তাহলে আমার। তুমিই আমার উত্তরপুরষ।' তিনি বৃদ্ধটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন। বৃদ্ধটি বললো, 'এতক্ষণতো তোমাকে ভালমানুষই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তুমি একটা আস্ত মতলববাজ।' তিনি বৃদ্ধটিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তখন বৃদ্ধটি বলে, 'বাবা তুমি এই যুবক বয়সে এসে আমার মত বৃদ্ধের পূর্বপুরুষ সেজে এসেছো। দেখ আমি বৃদ্ধ হলেও কিন্তু এতটা অবুঝ আমি নই। পাগল আর কি! ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো নইলে আমি পুলিশ কল করবো।'

মির্জা তার কথাগুলো বলার বা শোনার মত বা প্রমাণ করানোর জন্য আর কোন মানুষই খুঁজে পেলেন না। এই ব্যস্ত পৃথিবীতে কে কাকে সময় দেবে? এখন তিনি এ পৃথিবীতে একটা খাপছাড়া বিচ্ছিন্ন মানুষ ছাড়া কিছু নন। এদের সাথে কোনকিছুতেই তার মিল নেই। তিনি একাকি হাঁটেন আর ভাবেন। 'মিছেই জীবন দীর্ঘ করলাম। এখন যে যুগে এসে পৌঁছেছি এ যুগটা আমার নয়। এখানে আমার আপনজন বন্ধুবান্ধব সংসার কিছুই নেই। সবাই পৃথিবীর নিয়মে চলে গেছে বহুকাল আগে। সঙ্গীরা কেউই এখন বেঁচে নেই। নিঃসঙ্গ আমি বাঁচবো কাদের নিয়ে। তাই বুঝি সৃষ্টিকর্তা প্রতিটা

মানুষকে তার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় বেঁধে দেন। সে সময়ের মধ্যেই তাকে তার যোগ্যতা আর মেধা দিয়ে সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। সে সময়টাই কেবল তার জন্য উপযোগী ও মঙ্গলময় সময়। আমি যে সময়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম সেটাই ছিল আমার, এটা আমার সময় নয়। এখানে আমি বড্ড বেমানান। অতি পুরানো সেকেলে। এখন আমার মরণই শ্রেয়'। তিনি বিভ্রান্তের মত অচেনা পৃথিবীর পথধরে হাঁটতে থাকেন আর প্রার্থনার মত মনে মনে আওড়ান 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান... মরণ রে, তুঁ আও রে আও'।

নৈশ প্রহরী

প্রতিদিনের মত মনিরার একা গৃহে রাত নেমে আসে নিঃসঙ্গতা আর একাকিত্বের কাঁধে ভর দিয়ে। নিদ্রাহীন রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে পার হয়ে যায়। ফজরের আযান শোনা গেলে মনিরা বিছানা ত্যাগ করে যায় প্রাতঃকালীন কার্য সম্পন্ন করতে। এ সময় তার স্বামী নিয়ামত ঘরে ফেরে ডিউটি শেষ করে। ঘরের বেড়ায় লাগানো পেরেকে গায়ের শার্টটা খুলে ঝুলিয়ে রাখে। লুঙ্গি পরে হাই তুলতে তুলতে যায় শৌচাগারের দিকে।

মনিরা নিয়ামতের খাবার প্লেটে বেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখে। নিজে সামান্য পরিপাটি হতে হতে বলে – 'ভাত বাইরে রাখছি। খাইয়ে নাও, আমি কামে যাতিছি।'

'বেজায় ঘুম পাইছে রে বউ। ঢাহা থাহুক, পরে উইঠে খাবানি।'

'শুন, ঘরে কপাট দিয়া ঘুমাবা কলাম। তুমারতো কোন হুঁশ থাহে না। দিনে দুপুরে তুমার লাহান মরদ মানুষ ঘরে থাকতি কাইল আমার ভাত রান্দার বড় পাতিলডা চোরে নিছে ক্যাম্বায়?'

কথাগুলো বলতে বলতে মাথায় লম্বা কাপড় তুলে চলে যায় মনিরা তার নির্ধারিত বাড়িতে ছুটা বুয়ার কাজ করতে। সকালে গিয়েই বেগম সাহেবের ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে। নাস্তা বানানো, দুপুরের রান্না ও রাতের রান্না শেষ করে সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে। রাতের খাবার বেগম সাহেবকে বলে বাড়ি নিয়ে আসে সে।

সারাদিনের ক্লান্তি আর ঘাম ধুয়ে ফেলতে গোসল সেরে মনিরা যখন ঘরে আসে তখন নিয়ামত নাইট গার্ডের পোশাক পরে গুলশানের এক আলিশান বাড়ির ডিউটিতে যাবার জন্য তৈরী। ঘরে ঢুকে মনিরা শাড়িটা গুছিয়ে পরে। ভেজা চুলগুলো সুন্দর সিঁথি কেটে আঁচড়ে পিঠের উপর ছেড়ে দেয় । তাকের উপর হাত বাড়ায় সেখান থেকে

হেনোলাক্স ক্রিমটা নিয়ে মুখে লাগাল। সুগন্ধিতে মনটা যেন ফুরফুরে হয়ে যায়। রূপ যৌবন কোনটাই কম দেননি বিধাতা মনিরাকে। সেইসাথে আরো দিয়েছেন দরিদ্রতাও। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বেগম সাহেবের বাড়ি থেকে আনা ভাত ভাগ করে খায়। তাতেই তৃপ্ত। মনিরার এখন অখন্ড অবসর। একখিলি পান নিয়ে রঙিলা ভঙ্গিতে গা ঘেঁষে নিয়ামতের সামনে দাঁড়ায়। মুখের কাছে একখিলি পান তুলে ধরে। যেন নিয়ামত একটু হা করলেই নিজহাতে নিয়ামতের মুখে পুরে দিবে পরম আহ্লাদে। মোটাবুদ্ধি সম্পন্ন নিয়ামতের এ ভাষা বোঝার ক্ষমতা কোথায়? সে স্ত্রীর হাত-থেকে পানটা নিয়ে মুখে পুরে কোমড়ের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে রওনা দেয় কাজে।

মনিরা আলতো করে পিছন থেকে কোমড় জড়িয়ে ধরে বলে, 'শুন, একরাইত ডিউটিতে না গেলি কি হয় না?'

'কও কি বউ! তাইলে আমার নাইট গার্ড চাকরি কি থাকবেনে?'

'একলা ঘরে রাত্তির বেলায় ডর করে।'

'ডর কিসের?'

'কি জানি, মনেহয় কিডা যেন সারিরাত্তির ঘরের চারপাশ দিয়ে খচর মচর করে হাঁটাহাঁটি করতিছে।'

– 'ধুর! ওসব তুমার মনের ডর। আসলে কিচ্ছু না।'

নিয়ামতের বুকের উপর মাথাটা রেখে মনিরা বলে, 'আমার মনেহয় চোর আসে রোজ রাত্তিরে।'

'বুকা কুথাকার! আমার মত গরীবের এই ভাঙ্গাঘরে চোর আইসে কি করবি। কি এমন মূল্যবান জিনিস আমার আছে যে চোরে নিতি আসবি আন্ধার রাইতে।'

নিয়ামতের এই হতদরিদ্র জীবনে সব চাইতে মূল্যবান তার চাকরি। সেটাকে যেকোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে হবে।

বুকের উপর মিশে থাকা স্ত্রী মনিরার মুখের থুতনিটা হাত দিয়ে তুলে ধরে। স্বামীর সোহাগের পরশে আস্তে যেন চোখদুটো মুদে আসে। অনুভব করে হয়ত এখনই তাকে নিয়ে যাবে কোন এক অতৃপ্ত স্বর্গসুখের দোরগোড়ায়। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। অপেক্ষায় দ্রুত ওঠানামা করছে হৃদযন্ত্রটি। কিন্তু চোখ মেলে দেখে নিয়ামত তার মুখটা সরিয়ে নিজের শার্টের বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল প্রহরীর বাঁশিটা পকেটে ঠিকমত আছে কিনা। নিয়ামত চলে যায় কাজে। মনিরা কপাট লাগিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

নিয়ামত নাইটগার্ডের সামান্য বেতনের চাকুরে। সারারাত জেগে ডিউটি করে দিনেরবেলায় ঘুমিয়ে নেয়। এতদিন কোনমতে একা নিজের পেটেভাতে চলে যেত। জীবন নিয়ে বেশি কিছু ভাববার মত বুদ্ধি তার স্থূলমস্তিষ্কে নাই। ভাবনাহীন রোবটে জীবন একাই একই নিয়মে চালিয়ে যাচ্ছিল। বয়স বেড়ে গেলেও কোনদিন ভাবেনি নিজের বিয়ে-সংসারের কথা। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে জীবনের এই জৈবিক বিষয়ে তার কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। হয়ত সে সাহস হয়নি কোনদিন এই দুর্মূল্যের বাজারে। তবুও কীভাবে যেন হঠাৎ বিয়ের ঘটনাটা ঘটে গেল। একবার ঈদে গ্রামের

বাড়িতে বেড়াতে যাবার পর প্রতিবেশী মনিরার বাবা মৃত্যুশয্যায় তার হাতেই সঁপে দিলেন মাতৃহীন অষ্টাদশী কন্যাকে। দু'জনের বয়সেরও তফাৎ অনেক তবুও চল্লিশোর্ধ নিয়ামত না করতে পারেনি।

তবে ঘরে স্ত্রীর কাছে স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে পারুক বা না পারুক কর্মক্ষেত্রে নিয়ামত কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে নিষ্ঠার সাথে। অন্ধকার গলিতে নিজের ভাঙ্গা ঝুপড়ি ঘরে যুবতী স্ত্রী কতখানি নিরাপদ, সে ভাবনার চেয়ে সাহেবের আধুনিক সুসজ্জিত প্রাচীরঘেরা বাড়িটারে নিরাপদে রাখা তার কাছে অতি জরুরি। বাড়ির প্রতিটা কোনায় সার্চলাইটের আলো জ্বলজ্বল করছে। গেটের দু'ধারে গোলাকার কাচের বলের মধ্যে আলো জ্বলছে সার্বক্ষণিক। সেই বাড়িটাকে রাতের আঁধারে আরো সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্য নিয়ামতের সতর্ক প্রহরা। দু'দণ্ড ঘুম নেই চোখের পাতায়। মাঝে মাঝে বুক পকেট থেকে বাঁশি বের করে হুঁশিয়ারী সংকেত দেয়।

রাতের বেলায় মনিরা বিছানায় একা। ঘরের বাইরে খচমচ শব্দ। মনে হয় টিনের বেড়ায় কে যেন টোকা দিল। মনিরা শিউরে ওঠে। কান খাড়া করে। আবারো টোকা দেওয়ার শব্দ। ভয়ে মুখে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। জড়সরো হয়ে হাতের কাছে বটিটা নিয়ে বসে। নির্ঘুম রাত পেরিয়ে যায়।

এদিকে সাহেবের বাড়ির বিলেতি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। নিয়ামত বুক পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে জোড়ে ফুঁকে। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে বাড়ির কোনায় কোনায় পরখ করে। ঝাউগাছের তলা ফুলগাছের ঝোপ ভাল করে দেখে নেয়। আবারো বাঁশিতে ফুঁ দেয়। না কোথাও কেউ নেই।

সকালে উঠে মনিরা বেগম সাহেবের বাড়িতে কাজে যায়। ড্রেসিংটেবিলের ধুলো মোছে আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে পারফিউম নকশী করা বোতলটা দেখতে ভারী চমৎকার! বেগম সাহেব লক্ষ্য করেন সেটা। এ বাড়ির সবকিছুই চমৎকার লাগে মনিরার কাছে। যেমন চমৎকার বেগম সাহেবের ছোট শিশুপুত্রটি। বড্ড মায়া! ভীষণ বাধ্য। মনিরা তাকে নিয়েও কাজের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে। শিশুটিকে দেখে যেন মাতৃবাৎসল্য জেগে ওঠে নিজের অজান্তে। রঙিন টিভিতে হিন্দি সিনেমা দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে কী চমৎকার, কী সুন্দর প্রেম ভালোবাসা!

বেগমসাহেব আজ বাড়ি আসার সময় তার অর্ধ ব্যবহৃত সেই পারফিউমের বোতলটা মনিরাকে দিয়ে দিল। তলায় একটুখানি পারফিউম আছে। সেটা নিয়ে বাড়ি ফেরে মনিরা। বোতলটা বের করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। সাজিয়ে রাখবে ঘরের কোনখানে। হঠাৎ টিপ পরে বোতলের মুখে। ফুস্ করে ধোঁয়ার মত বের হয়ে মনিরার ব্লাউজের সামনের বেশখানিকটা ভিজে যায়। কেমন শিরশির করে ওঠে শরীর। আহা কি দারুণ বাসনা!

নিয়ামত বলে, 'কীসের শব্দ যেন হুনলাম!' 'হ ঠিকই হুনছো।'

'কীসের শব্দ? কোনখানে?'

মনিরা এগিয়ে কাছে যায়। নিয়ামতের চোখের সামনে গিয়ে বলে,

– এই হানে।

নিয়ামত হা করে তাকিয়ে থাকে। এর ভিতর থেকে শব্দ হয় কীভাবে বুঝে উঠতে পারে না।

'বিশ্বাস হয় না? নাকটা লাগায়ে দেহ কোন বাসনা পাও কিনা।'

নিয়ামত তবুও বুঝতে পারে না কি বলছে। একটান দিয়ে বুকের কাপড়টা সরিয়ে ফেলে নিয়ামতের মাথা টেনে নাকটা লাগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমার কোন কথাই তোমার বিশ্বাস হয় না, না? মিথ্যা কইছি কিনা দেহ শুইকে।'

মাথা তুলে বলে, 'হ, খুব সুন্দার বাসনা । ভাত দিবা না খাতি ? কামে যাবার সুমায় পার হইয়ে যাচ্ছে।'

মনিরা ভাতের থালা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেয় নিয়ামতের সামনে। নিস্পৃহ নিয়ামত! রাগ অভিমান আবেগ ভালোবাসার কোন সংজ্ঞাই তার জানা নেই। সে খেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি।

সন্ধ্যা থেকেই গুমোট আবহাওয়া। আকাশ মেঘলাই ছিল। বাইরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। নিয়ামত তাড়াতাড়ি চলে যায় কাজে বৃষ্টি নামার আগেই।

মনিরা দরজা লাগিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ে। টিনের চালে শুকনো পাতা ঝরার শব্দ। আজ বাইরের কোনশব্দেই সে ভয়ে কেঁপে উঠছে না। ঘরে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। বাইরে খচখচ শব্দ মনে হলো। মনে হলো টোকা দেওয়ার শব্দ।

মনিরা বলে, 'কিডা?' উত্তর নেই। এবার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ। মনিরা বলে, 'বাইরে কিডা? কথা কয় না ক্যান?'

এবার বাইরে থেকে উত্তর আসে, 'আ- আমি।'

মনিরা উঠে যায় নির্ভয়ে। সটান দরজা খুলে, 'আরে হাবিবুল ভাই যে!'

'আমি কাম শেষে এইপথ দিয়েই প্রত্যেক দিন মেসে যাই।'

'আপনি এই পথ দিয়ে প্রত্যেকদিন যান আর আমারে একদিনও দেখতে আইলেন না। কেমন পাষাণ আপনি?'

'না প্রত্যেকদিন যাই ঠিকই তবে রাইত হইয়া যায়তো। তাই আর তোমাগো ডিস্টাব করি না।'

মনিরা আর কোন কথা বাড়ায় না। তাকে দেখে আজ খুব মনে পড়ে তার বাড়ির কথা। গ্রামের কথা। হাবিবুল মনিরাদের একই গ্রামের ছেলে। বাড়িও ছিল কাছাকাছি। ঝড়ে আম কুড়ায়ে মনিরা ভর্তা বানিয়ে খাওয়াতো তাকে। তারও কি কম টান ছিল! খেজুরের রস গাছ থেকে পেরে চুপি চুপি মনিরাকে খাওয়াতো। আরো কত কি! সে এখন ঢাকায় গার্মেন্টেস-এ চাকরি করে। চারপাশ তাকিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'এম্বায় একলা ঘরে তুমার ডর করে না মনিরা?'

'আমি একডা মানুস, আমার আবার ডর'

'তুমি ভালা আছতো?'

'হঁ। জব্বর ভালা'

আচ্ছা আমি যাই।'

'যাবেন কেমনে? বাইরে তুফান ঝাড়ছে। ভিতরে আসেন।' বলে ঘরের ভিতরে নিয়ে বসতে দেয় মনিরা।

'আপনি এই পথ দিয়ে রোজ যান আর আমার কোন খবর নেন না।'

'তুমার সব খবরই আমি রাখি। কিন্তু সময় পাই না।'

বাইরে প্রবলবেগে ঝড় ছেড়েছে। ঝড়োবাতাস সশব্দে অনবরত দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। ঘরের বিদ্যুৎটা হঠাৎ চলে যায়। অন্ধকারে হাবিবুল বলে,– ভয় কইরো না। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাচ্ছি।'

প্রচণ্ড গতিতে খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঘরে আসছে। পকেট থেকে দেশলাই বাক্স বের করে বারুদে বারুদ ঘষা দেয় হাবিবুল। আলো জ্বলে ওঠে। মনিরা মোমবাতি ধরায়। সেই আলোয় ঘরের খোলা কপাট লাগিয়ে দিতে যায়। হাবিবুল তখন উঠে দাঁড়ায়। এসে দরজার কাছে এগিয়ে যায়। মনিরা মৃদু হেসে সিটকিনি লাগাতে লাগাতে বলে, 'ভালই হইছে আপনি আসছেন, নইলে এমন ঝড়ের রাইতে আমারে একাই একলা আন্ধার ঘরে রাত কাটাইতে হইতো। বসেন বিছানায়।'

বেশ খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছে মনিরার সিটকিনিটা লাগাতে। হাবিবুল এসে মনিরার হাতের উপর হাত রাখে। সে সিটকিনি বন্ধ করতে সাহায্য না করে অর্ধ লাগানো সিটকিনি খুলে দরজার বাইরে চলে যায়।

মনিরা জিজ্ঞেস করে,

'কই যান ঝড়ের রাইতে?'

'ঘরে যাই, পুরোপুরি ঝড় ওঠার আগে।'

'এই তুফান রাইতে বাইরে যাবেন?'

'হঁ, আমারে যাইতে হবে। তোমার ভাবী পোয়াতী, একলা ঘরে ডর পাইবো' 'তুমি বিয়া করলা কবে! তোমার বউ পোয়াতী?' মনিরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। 'করছি, তয় তুমার বিয়ার পর। সে সংবাদ তোমারে দেওয়া হয় নাই।'

'আমার উপর তোমার খুব রাগ?'

নাহ্। আমি সব জানি। চাচাজান মরণের সময় আমি চাকরির খোঁজে ঢাকায় আছিলাম। তোমার কোন খোঁজ খবর রাখতে পারি নাই। সবই কপাল! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে, 'তো আমি যাই। ভাল থাইকো।' হাবিবুল চলে গেল। মনিরার বুকের মধ্যে কোথায় যেন কীসের তরে চাপা ব্যথা অনুভূত হল। ঝড়ো বাতাসে তার ঘরের খোলা দরজা এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

আজ ভোরের ফ্লাইটে নিয়ামতের সাহেব সিঙ্গাপুর গিয়েছেন। যাবার সময় নিয়ামতকে ডেকে বলে গিয়েছেন ছয়/সাতদিনের জন্য দেশের বাইরে থাকবেন। বাড়িতে ম্যাডাম একা। ঠিকমত যেন সব দেখে শুনে রাখে। কিন্তু সন্ধ্যারাতেই এ বাড়ির বান্ধা কাজের বুয়া মতির মা ব্যাগ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বলে গেল ম্যাডাম তারে দু'দিনের ছুটি দিয়েছে। গ্যারেজের পাশে ড্রাইভারদের ঘরটা খালি। ওদেরও ছুটি দিয়েছেন ম্যাডাম। এত বড় দোতলা বাড়িতে ম্যাডাম একা রাতে থাকবেন।

নিয়ামতের দায়িত্ব আজ আরো বেড়ে গিয়েছে। বাইরে গুমোট আবহাওয়া। লোহার গেট লক করে দিয়ে চাবি হাতে নিয়ে টুলে বসে। দমকা বাতাস শুরু হয়েছে। অন্ধকারে একটি দামি জিপের হেড লাইটের আলো এসে পরে গেট বরাবর। ঠিক যেন নিয়ামতের চোখের উপর। গাড়ির ভিতর থেকে হর্ন টিপছে। নিয়ামত দৃঢ় হাতে গেটের

চাবিটা চেপে ধরে আছে। সে অজানা কাউকে রাতের বেলায় বাড়িতে প্রবেশ করতে দিবে না। এমন সময় উপর থেকে ইন্টারকোমে ম্যাডাম ফোন করে নিয়ামতকে। কথা না বাড়িয়ে গেস্টকে ভিতরে ঢুকতে দিতে বলে। ম্যাডামের নির্দেশে সে গেট খুলে দেয়। গাড়ি থেকে একটি অচেনা সাহেব নামেন। রাতের গাউন পরিহিতা ম্যাডাম নিজেই এগিয়ে এসেছেন সিড়ি পর্যন্ত। সাহেব ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে উপরে সোজা বেড রুমে ঢুকে পরেন। দু'জনের মিলিত হাসির ধ্বনি ঝড়ো বাতাসে মিলিয়ে গেল।

নিয়ামত হা করে সব দেখল। তার মোটা মস্তিষ্কে তড়িৎবেগে কি যেন অনুভব করলো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। মেঘের গর্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাতাস প্রবলতর বেগে বইতে শুরু করেছে। নিয়ামত হাতের লাঠিটা ফেলে দিল। বুকপকেট থেকে বাঁশিটা খুলে ঝড়ো বাতাসে উর্ধ্বে ছুঁড়ে ফেললো। বাতাসে শিস বেজে উঠল। দ্রুত রওনা হলো নিজ গৃহপানে যেখানে একাঘরে স্ত্রী মনিরা নিদ্রাহীন ভয়ার্ত রাত কাটাচ্ছে।

নাইট গার্ড

নিয়ামত কাজ থেকে সকালে ঘরে ফিরে দেখে মনিরার ঘরের দরজা বন্ধ। সে ঘুম থেকে এখনো ওঠে নাই। গতরাতের ঝড়ে ঘরের বাইরে থাকা ভাঙ্গাচেয়ার ঝুড়ি বদনা সব উলোটপালোট হয়ে আছে। ঘরের দুয়ারে কাদা পানি জমেছে। দরজায় কড়া নাড়ে নিয়ামত। মনিরা ঘুমমিশ্রিত চোখে দরজা খোলে। সকালের নরমরোদ মনিরার মুখের উপর পড়ে চিকচিক করে উঠে। কেমন মিষ্টি আভা ছড়ানো তাতে।

নিয়ামত তাকিয়েই রয়। কখনও এভাবে সে মনিরাকে দেখেনি। বউয়ের চেহারা কেমন কতটুকু শোভা কী শ্রী তাতে মাখানো আছে সে জানতো না। সে জানে রাতে ডিউটি দিনে ঘুম। সন্ধ্যায় মনিরা ছুটাবুয়ার কাজ শেষ করে ঘরে ফেরে তখন নিয়ামত পোষাক পরে বের হয় মার্কেটে নাইট গার্ডের ডিউটি দিতে।

একা গৃহে মনিরার রাত কাটে ভয়ে ভয়ে। স্বামীকে বহু দিন বলেছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এ জীবন মেনে নিয়েছে মনিরা এখন আর কোন আক্ষেপ নেই তাতে। পেটে ভাতে জীবন চলে যেতে পারলেই হয়। গ্রামের গরীব চাষীর এতিমকন্যা। বয়সের ব্যবধান দু'জনের বেশ। নিয়ামত মানুষটি মন্দ নয়। তবে একটু বোকাসোকা ধরনের। জীবনের জৈবিক চাহিদার চেয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদই তার বেশি। দু'মুঠো খাদ্য জোগাড় করতে পারলেই সে তুষ্ট। মোটা খাবার মোটা কাজই জীবন। সূক্ষ্ম চাহিদা বা চিন্তা ভাবনার জগত থেকে তার জগত যেন বহুদূরে।

স্তম্ভের মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনিরা বলে, 'কি ব্যাপার ওম্বায় বাইরি খাড়ায় কি দেখতিছ? ঘরে যাও আমি কামে গেলাম।' নিয়ামত বলে, 'আইজ কামে না গেলি হয় না বউ?'

'ক্যান?'

'আমার কাছে থাহো কিছুক্ষণ।' এই প্রথম বউকে কাছে রাখার আবদার শুনে মনিরা কিছুটা অবাক।

'ওমা কয় কি বলদডা!'

'আজ বাড়িত থাকো। দুইজনে গল্প গুজব করি।'

'ক্যান, কি হইছে তোমার?'

কিছু না।' বলেই মনিরার মুখের সাথে মুখ ছোঁয়ায়। যেভাবেই কথা বলুক না কেন মনিরার কিন্তু মনে মনে কিছুটা ভাল লাগছিল বৈকি। কোনদিন সে এভাবে তার সাথে কথা বলেনি। গোঁয়ার মূর্খ তার মুখ দিয়ে আজ কি ভাষা বেরোচ্ছে। তবুও ইচ্ছে আরো একবার বলুক। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে 'কামে না গেলি আমার চাকরি থাকবেনে?' নিয়ামত এবার ঘরে প্রবেশ করে পথ আগলে ধরে। জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে নিয়ামত দরজা বন্ধ করে দেয়। মনিরা স্পষ্ট বুঝতে পারে আজকের আচরণ কিছুতেই স্বাভাবিক নয় তার। নিয়ামত তাকে প্রবল শক্তিতে এই প্রথম জাপটে ধরেছে। আদিম নেশায় মাংশপেশী দৃঢ়। তার মুখে ঝাঁঝালো ভোদকার গন্ধ। যে গন্ধের সাথে কখনো পরিচিত নয়। তবুও স্বামীর ইচ্ছে পূরণে না বলতে পারেনি।

নিয়ামত সেখানেই পরে বেঘোরে ঘুমিয়ে যায়। মনিরা বাহির থেকে দরজা টেনে দিয়ে কাজে চলে যায়। যেতে যেতে ভাবে আজ কি হইছে তার হঠাৎ এমন আচরণ! সে তো ডিউটি আর ঘুম ছাড়া এ জগতের কিছুই বোঝে না। কখনো বুঝতেও চায়নি স্ত্রীর মনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। কত রাত মনিরার বিফল মনোবাসনায় কেটেছে তার খবর কি নিয়ামত জানে? সে জানে সন্ধ্যা হলেই ডিউটিতে যেতে হবে। তাকে রাত জেগে মার্কেটের নাইট গার্ডের চাকরি নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। এ চাকরিটা খুবই দায়িত্বশীল আবার বিপজ্জনকও বটে। তবে নিষ্ঠার সাথে সে কাজ করে যাচ্ছে। তার যুবতী বউ সারাদিন ছুটা বুয়ার কাজ করে ঘরে ফিরে রান্না সেরে ভাত বেড়ে দেয়। সেটুকু খেয়েই ছুটে বের হয় নিয়ামত।

আজ ভোররাতে মার্কেটের একটি দোকানে মানুষের শব্দ পেয়ে ছুটে গিয়েছিল নিয়ামত। দোকানটি ফার্নিচারের। রাতে সে দোকানের কর্মচারী সগীর থাকে। সে দুই সন্তানের জনক। স্ত্রী পুত্র গ্রামেই থাকে। মালিকের বিশেষ পরিচিত বলে দোকানে থাকার অনুমতি পেয়েছে। সে একটি মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করছিল। আসলে এ কাজটি নিয়মিত করে স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন নাইট গার্ড নিয়ামতের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে। এই মেয়েটিকেও নিয়ামত চিনে। নাম কমলা এই মার্কেট ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে। মেয়েটি সগীরের প্রেমের প্রলোভনে পড়ে এখন অন্তঃস্বত্তা। বমির শব্দ লুকাতে পারেনি কমলা। ঝাঁপ লাগানো ফার্নিচারের দোকানের সামনে নিয়ামত এসে হাজির। ধাক্কা দেয় ঝাঁপটি ধরে। এক সময় সগীর ঝাঁপ খুলে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। ভিতরে উঁকি দিয়ে নিয়ামত কমলাকে দেখতে পায়। সন্ধ্যার পর এখানে কোন মেয়েমানুষ থাকার নিয়ম নেই। সে কথা নিয়ামত বলতেই সগির নিয়ামতকে অনুরোধ করে যেন দোকানমালিককে না বলে। কিছু খাবার খেতে দেয় তাকে। সাথে একটি কোকের বোতল। যার ভিতর বাংলা পানীয়। নিয়ামত কখনও এসব খায়নি তাই বুঝেও না। ভোর হয়ে গেছে পেটে ক্ষুধাও লেগেছে। নিয়ামত পথে আসতে আসতে খাবারগুলো

খেয়ে নেয়। কিন্তু কেমন যেন বিশ্রী রকমের স্বাদ। তবুও খেয়ে নিয়েছিল সে। মাথা চক্কর দিচ্ছিল। টলমল পায়ে বাড়ি ফিরেছে কোন মতে। সব কিছু যেন ঘোলা ঘোলা। নেশার ঘোরে তাই স্ত্রী মনিরাকে যেন সেই রঙিলা মেয়েটির মতই মনে হল। এরপরের ঘটনাগুলো তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাই ঘুম থেকে উঠে নেশা ছুটে গেলে ভুলেও গিয়েছে সব।

আবারো আগের মত নিত্যদিনের অভ্যস্ত জীবনে ফিরে আসা। ডিউটি আর ঘুম। মনিরা সেদিনের সেই ব্যতিক্রম ঘটনা ভেবে নিজে নিজে পুলকিত হয়। কয়েকদিন হলো তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। হঠাৎ সেদিন বেগম সাহেবের বাসায় কাজ করতে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেগম সাহেবের বড়কন্যা ঢাকা মেডিক্যালে ইন্টার্নি করছে। সে পরীক্ষা করে দেখে মনিরাকে। সেদিন তাকে আর কাজ করতে দেয়নি বেগম সাহেব ছুটি দিয়েছেন। কিছুটা সুস্থবোধ করলে মনিরা খুশিমনে বাড়ি ফেরে। মনিরা বাসায় আসে সুন্দর করে শাড়ি পরিপাটি করে স্বামীর কাছে এসে কিছু একটা বলবে। কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। এরই মধ্যে নিয়ামত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কি ব্যাপার খাবার দিবা না। কামে যাবার দেরি হতিছে। খাড়ায় খাড়ায় কি দেকতিছ?' মনিরা থতমত খেয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি ভাত এগিয়ে দেয় নিয়ামত খেয়ে চলে যায়। ওদের যাপিত জীবনের কোন পার্থক্য ফিরে আসে না।

মাকের্টে কমলার সাথে দেখা। ঢাউস পেট নিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে। তার স্বামী সুরুয মিউনিসিপ্যালটির সুইপার। বাংলা মদ আর তারি নিয়ে রাত পার করে দেয়। রাতে তার কোন হুঁশ থাকে না। কমলার সাথে সগীরের আর সম্পর্ক নাই। মাঝে মাঝে দোকান মালিক কিংবা কাস্টমাররা তাকে পোয়াতী শরীরে কাজ করতে দেখে বখশিস দেয়। নিয়ামত সবই দেখে।

দুপুরে নিয়ামত যখন মধ্য ঘুমে, মনিরা বাড়ি ফিরে আসে। শরীরটা খুবই খারাপ। ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। দুয়ারে বসেই বমি করছে মনিরা ওয়া-কি ওয়া-ক টেনে। বমির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। শব্দটা তার পরিচিত। সেদিন দোকানে মাকের্টে কমলা যে শব্দে বমি করছিল। এটা সে রকমই শব্দ। কমলা এখানেও। নিয়ামত ভাবে। ঘুম থেকে উঠে যায়। শব্দের কাছকাছি যেতেই দেখে মুখ ধুয়ে মনিরা ঘরে ঢুকে পুরানো তেতুলের কৌটা খুলে নিয়েছে। নিয়ামত জিজ্ঞেস করে; 'কি খাও?'

'কিছু না। ওইহান থেন নুনের বাটিটা ধইরে দিবা?' খুব দুর্বল দেখাচ্ছে তাকে। আবারো জিজ্ঞেস করে, 'কি হইছে তোমার?'

'বুঝতি পারো না? পোয়াতী হইছি।'

'পোয়াতী?' বলে নুনের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে নিয়ামত কাজে চলে যায়। নিয়ামতের মনেপড়ে সেদিন মার্কেটে সগির আর সেই মেয়েটির কথা। কত কিছুইতো সম্ভব এখনকার দুনিয়ায়। তাইলে কি একলা ঘরে মনিরাও ফুর্তি করে। ভাবতে ভাবতে ডিউটিতে চলে যায়।

সেদিন সকালে ঘরে ফেরে না। ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে মনিরা চলে যায় কাজে। দুপুরে এসে ভেজানো দরজা খুলে নিয়ামত ঘরে ঢুকে। খাবার ঢেকে রেখে গেছে মনিরা। কিন্তু খাবারে রুচি নেই তার। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে নিয়ামত। মনে

নানান প্রশ্ন নানান সন্দেহ জাগে কিন্তু জিজ্ঞাসা করার ভাষা খুঁজে পায় না। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

কয়েকমাস পরে একটি নবজাত শিশু ঘরে এলো। নিয়ামত কাজ থেকে ঘরে আসে আর আবার কাজে যায় আগের মতই। কোন ব্যতিক্রম নেই তার চালচলনে। মনিরা ভীষণ ব্যস্ত বাচ্চাটিকে নিয়ে। এজন্য বেগম সাহেবের কাছ থেকে ছুটিও নিয়েছে দু'মাস বাচ্চাটিকে বড় করে তোলা পর্যন্ত। মনিরার কোলে শিশুটি কখনো কাঁদে কখনো হাসে খেলা করে । একই ঘরে নিয়ামত নির্বিকার। সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। কোনদিন ও শিশুটির দিকে ফিরেও তাকায়নি। দেখেনি তার চেহারা আজ পর্যন্ত। শিশুটির কোন প্রসঙ্গ মনিরা উঠালে সে নিশ্চুপ থেকেছে। ভালোমন্দ কোন মন্তব্য করে না। এ নিয়ে মনিরাও বাড়াবাড়ি করে না। এখন মনিরার রাতে ভয় করে না। নিসঃঙ্গ লাগে না। রাতকেটে যায় শিশুটিকে নিয়ে। দুধ বানিয়ে ভেজাকাঁথা পাল্টাতে পাল্টাতে কখন যে দিন শুরু হয়ে যায় বুঝে উঠতে পারে না। প্রসূতিকালীন সব ছুটি কাটিয়ে ফেলেছে মনিরা এবার আবার কাজে যোগ দিবে। বেগম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে সে দিনে দুবার বাসায় আসবে বাচ্চাটিকে দেখতে। বাচ্চাটি বেশ নাদুস নুদুস হয়েছে। দিনের বেলায় নিয়ামত ঘরে থাকে ঘুমিয়ে। তার পাশেই আস্তে করে ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে রেখে কাজে যায় চলে মনিরা। নিয়ামত একবার পাশ ফিরতে গিয়ে দেখে বাচ্চাটি তার পাশেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সেও পাশ ঘুরে উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়। আবার ঘুমে বিভোর হয়ে নাক ডাকতে থাকে। বাচ্চাটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ একা একা খেলা করে। 'ওয়াও ওয়া' জাতীয় অজানা অভিধানের দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে একা একাই কথা বলে। তাতে নিয়ামতের ঘুমের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। কানে বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে। এবার বাচ্চাটি কেঁদে ওঠে। ভীষণ জোরে কাঁদছে। নিয়ামত আর থাকতে পারছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কি যন্ত্রণা। তুলে বাচ্চাটিকে এক আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিবে। চিরদিনের জন্য তার কান্না থামিয়ে দেবে সে। লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে নিয়ামত। বাচ্চাটিকে বিছানা থেকে নিয়ে উর্ধ্বে তুলে । এখনি দিবে এক আছাড় চিরদিনের জন্য আপদ বিদেয় হবে। ওমনি বাচ্চাটি কান্না থামিয়ে ফিক্ করে হেসে দেয়। নিয়ামত হঠাৎ কেমন যেন চুপসে যায়। বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে রয়। চেহারা অবিকল নিয়ামতের বাবার মত। অপলক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ কতকাল আগের দেখা ঠিক তার বাবার চোখ নাক ঠোঁটের দিকে। তাহলে কি এটি তারই সন্তান। সেটা কি করে সম্ভব? ঘোর লাগে চোখে। সকালের রোদ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিশুটির মুখের উপর পড়ে চিকচিক করে ওঠে সেদিনের মত। ঠিক সেদিন যেমন দেখছিলো মনিরাকে। সব মনে পড়ে গেল। নিয়ামত মুচকি হাসে। মনের অজান্তে বেরিয়ে যায়, বা-বা! বাবা।

মনিরা তখন দুয়ারে এসে পৌঁছেছে। দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ামত ঘরের মধ্যে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার সাথে বকবক করছে, 'কেমন আছো বাবা? কি হইছে তুমার? কি খাবা তুমি? একটু সবুর করো, মা আসবে।'

কোজাগরী

(প্রথম পর্ব)

রক্তিম বর্ণ ধারণ করে পুবাকাশে প্রভাতের আলো ছড়াতে শুরু করেছে মাত্র। এ সময় ঢাকা-মধুখালির মহাসড়ক প্রায় খালি। লোকজন এমনকি যানবাহনও তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। বহুদূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটি লেগুনা ভ্যান গাড়ি। গাড়িটি ক্রমশ সামনের দিকে এগুচ্ছে আর মহাসড়কের দু'পাশে ঘনসবুজ ধানক্ষেতের আগায় মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সর্পিল আকারের সড়কের বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে চলা গাড়িটির পিছনে একটি বাই-সাইকেলসহ সাংসারিক বেশকিছু মালপত্র। সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে প্রায় ঠাসাঠাসি করে বসে আছে মনি সরকার ও তার স্ত্রী পলি। পলির কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের ছয় বছরের একমাত্র পুত্র অমিয়। গাড়িটি এখন ঢাকামুখী। ওরা পাশাপাশি বসে থাকলেও ড্রাইভারের উপস্থিতিতে দু'জন কথা তেমন বলছে না। মাঝে মাঝে ড্রাইভারের সামনে টাঙানো লুকিং গ্লাসে দু'জনের চোখাচোখি হচ্ছে। সেই চোখের ভাষা দু'জনই যেন পড়তে পারছে। ওদের দু'চোখ ভরা আজ আনন্দস্বপ্ন! সেই স্বপ্নপূরণের স্বপ্ন নিয়েই যাচ্ছে ঢাকাবাসী হতে।

মনি সরকার ভাবছে মনে মনে 'পলি এতদিনে আমি তোমাকে তোমার স্বপ্নের সংসার উপহার দিতে যাচ্ছি । আর আমাদের সন্তান পাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।'

পলি মনে ভাবছে 'এতদিনে তোমাকে তোমার সঠিক স্থানে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিয়মিত লেখালেখি করবে। অনেক বড় লেখক হবে। আর প্রতিদিন একটি করে কবিতা লিখবে। সেটা আমার জন্য, শুধুই আমার জন্য। এই সুখচিন্তায় দুজনের চোখাচোখি হলেই মুচকি হাসিতেই দু'জন সীমাবদ্ধ রাখছে।

ঢাকার পরিবেশে সুন্দর একটা স্কুলে অমি পড়ালেখা করবে। একদিন অনেক বড় হবে অমি ঠিক তার মা পলি যেমনটা চায়। মনি সরকার মফস্বলে সাংবাদিকতা করে কত দূর এগুতে পারবে? যদিও স্থানীয় বন্ধু ও স্বজনরা তার লেখার খুব তারিফ করে কিন্তু ঢাকাই হচ্ছে শিল্প-সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থল। খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের সাথে থাকবে ওঠাবসা। তার লেখা বড় বড় পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। ছড়িয়ে পড়বে ওর সুনাম।

ঠিক দুপুর নাগাদ ঢাকায় এসে পৌঁছল ওরা। সরাসরি মনির ভাড়া করে রাখা বাড়ির সামনে। পকেট থেকে ঘরের চাবি বের করে মনি দরজা খোলে। ইতোমধ্যে অমিয়র ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। আনন্দে এক দৌড়ে সে নতুনগৃহে প্রবেশ করে। মনি সারাবাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পলিকে দেখায়। এটা বেডরুম, এটা বাথরুম, এটা তোমার রান্নাঘর। ঘরের ভিতর পানির ব্যবস্থা সব জায়গাতেই আছে। বাইরে যেতে হবে না। পলি ব্যাগ স্যুটকেস খুলে গোছগাছ শুরু করে দেয়। চাল ডাল তেল লবণসহ বাড়ি থেকে কিছু শুকনো খাবারও সঙ্গে নিয়ে এসেছে পলি।

মনি বললো, 'পলি এবার তুমি তোমার নতুন সংসার গুছিয়ে নাও। আমি একটু বেরোচ্ছি ।'

'কোথায় যাচ্ছ? কিছুই তো খাও নি।'

যাবো পত্রিকা অফিসে। আগে চাকরিটাতো ঠিক করে আসতে হবে। মিরুভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে ঢাকায় এসেই যেন দেখা করি। তুমি খাবার রেডি করো, এসে খাবো।'

বলে মনি সরকার গেলেন 'দৈনিক মৃত্তিকা'র অফিসে। মফস্বল প্রতিনিধি হিসেবে পত্রিকার সাথে যোগাযোগ। এখানে তার অফিসিয়াল চাকরি হয়ে গেল মাসিক বেতনে। এখন মনি সরকারের চিন্তা পুত্র অমিকে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, ঢাকায় সবচেয়ে ভালো স্কুল কোনটি? যেখানে খুবভালো লেখাপড়া করানো হয়।'

'কেন?'

'আমার ছেলেকে ভর্তি করাবো।'

'আছেতো বেশ কয়েকটি। তার আগে বলুন আপনার বাসা কোন এলাকায়?' বললেন, 'বাড্ডা।'

'তাহলে গুলশান আপনার বাসা থেকে কাছে হবে। ওখানে নামিদামি এবং উন্নত লেখাপড়া করায় এমন কয়েকটা স্কুল আছে।'

আমাকে ঠিকানা দিতে পারবেন?'

নিশ্চয়ই।'

লোকটির কাছ থেকে মনি সরকার ঠিকানা টুকে নিয়ে বাসায় এলো। পরদিন স্ত্রীসহ তৈরী। অমিকে স্কুলে ভর্তি করাতে যাবে। পলি অমির চুল ঠিকমত আঁচড়িয়ে নিজেও পরিপাটি করে শাড়ি পরে নেয়। অমি খুশিতে বলে, আজ থেকে আমি স্কুল বয়।'

অমির ছোট্ট নাকটি আহ্লাদে একটু টেনে পলি বলে, 'হুম। চলো এবার বের হই।'

ঠিকানা নিয়ে বেশ খোঁজাখুঁজি করে গুলশানের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে উপস্থিত হলেও দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না কারণ স্কুলে অ্যাসেম্বলি কেবল শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা স্কুলে ঢুকতে পারে। দারোয়ান রিসেপশনিস্ট এর কাছে নিয়ে যায়। এই অসময়ে তাদের পুত্রকে স্কুলে ভর্তির অভিলাষের কথা শুনে বললো, 'এখন তো স্কুলে স্টুডেন্ট ভর্তি করা যাবে না। আপনারা বৃথা অনুরোধ করবেন না প্লিজ।'

শুনে অমির মন খারাপ হয়ে যায়। তার স্কুলটা খুব পছন্দ হয়েছে। কি সুন্দর পরিপাটি স্কুল। দূর থেকে ক্লাসে ইউনিফর্ম পরা অনেক ছেলেমেয়েদের দেখতে পারছে। ও ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল স্কুলটি। ঘুরতে ঘুরতে সে প্রিন্সিপ্যালের রুমে ঢুকে পরে।

'হ্যেই বয়, হু আর ইউ?' মহিলা কণ্ঠে বিশাল গর্জনে ছোট্ট অমি থতমত খেয়ে যায়। এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

ধমকে জিজ্ঞেস করে, 'এই ছেলে, কে তুমি?'

'আ আ- আমি অমি।'

'কি আমি আমি করছো, কি নাম তোমার?'

'তোমার ধমকে ভয় পাচ্ছি যে, আমি অমিয়।' এবার সাহস করে বলেই ফেলে অমি। 'এখানে কি কর?'

এখানে পড়ালেখা শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু ওরা দিচ্ছে না।'

রেগে উঠে দাঁড়ায় । 'কীভাবে তুমি আমার এখানে এলে ? চল আমার সাথে।'

ভর্তি হতে এসেছিলাম। জানো, স্কুলটা খুব সুন্দর। আমার খুউব পছন্দ।' রাগান্বিতা প্রিন্সিপ্যাল রিসিপশনের দিকে যায়।'

মনি ও পলির অনুরোধে এবার রিসিপশনিস্ট বুঝিয়ে বলছে, 'দেখুন, আপনাদের হয়তো জানা নেই এটা খুবই নামকরা একটি স্কুল। এখানে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তির অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হয়। প্রথমে গার্ডিয়ানদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তারপর স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ। মনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ না হয় প্রয়োজন পরতে পারে,তাই বলে গার্ডিয়ানদের কেন? তারা কি স্কুলে এসে পড়ালেখা করবে?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার। এখানে সব ক্লাসি মানুষের সন্তানরা লেখাপড়া করে । মানে দেশের অভিজাত শ্রেণির লোকের সন্তানরা কেবল এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া সব অভিভাবকের তো সামর্থ্য থাকে না এই স্কুলে বাচ্চাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো।' মনির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রিসিপশনিস্ট তখনো শুনিয়ে যাচ্ছে স্কুলের নিয়ম কানুন। এবার জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আপনি কি করেন বলুন তো?'

একটি পত্রিকা অফিসে চাকরি করি।' মনি সরকারের জবাবে সে হতাশার সুরে বলল, চাকরি! তো ম্যাডাম আপনি কি কিছু করেন?

আ- আমি কিছু করি না।' পলি বেশ সংকোচে পড়ে গেল।

ও-। একটা কথা বলি,আমার মনেহয় এই স্কুলের টিউশন ফি অ্যান্ড আনুষঙ্গিক ব্যয় পোষানো আপনাদের জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এরচেয়ে ভাল কোন বাংলা মিডিয়াম স্কুলে গিয়ে দেখতে পারেন।'

প্রিন্সিপ্যাল ততক্ষণে অমিসহ উপস্থিত। তিনি সবই শুনেছেন। মনি আর পলি দু'জনেই হতাশাগ্রস্ত মনে ফিরে যাচ্ছে। অমি জানে না স্কুলে ভর্তির নিয়ম কানুন শৃঙ্খলা। সে জেনেছে স্কুলে পড়লে বড় হওয়া যায়, বড় হয়ে প্লেনে চড়ে বিদেশ যাওয়া যায়। অমি সরাসরি প্রিন্সিপালকে প্রশ্ন করে, আমি কি লেখাপড়া শিখে বড় হতে পারবো না?' প্রিন্সিপ্যাল কিছু একটা ভাবছেন।

পলি অমির হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে, এখানে না। চলো, অন্যকোন স্কুলে।

হঠাৎ প্রিন্সিপ্যাল বলে ওঠে, না, ও কোথাও যাবে না। অমিয় এই স্কুলেই পরবে।' আপনি!' 'অবাক হয়ে মনি সরকার জিজ্ঞেস করে।

'আমি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। স্পেশাল কন্সিডারেশনে ও এখানেই পড়বে।' কথা শুনে সবাই অবাক। রিসিপশনিস্ট ভর্তির ফর্ম বের করে।

পলি ঢাকার রাস্তাঘাটের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। পরদিন স্কুল শেষে বেশ খুশি মনে ওরা তিনজন বাসায় ফিরছিল। গুলশানের একটা আলিশান ফার্নিচারের দোকানের সামনে দিয়ে ওরা যাচ্ছিল। মনি সরকার বাইরে থেকে দোকানের কিছু একটা লক্ষ্য করে স্ত্রীকে বলে, 'তোমরা একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।'

স্বচ্ছ কাচঘেরা দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে মনি সরকার। বাইরে থেকে পলি লক্ষ্য করে মনি সরকার মুগ্ধ হয়ে একটি সুন্দর কাঠের ইজি চেয়ার অর্থাৎ আরাম চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। সেলসম্যানকে ডেকে দাম জিজ্ঞেস করে। সে চেয়ারে ঝুলানো ট্যাগটি দেখিয়ে দেয়। মনি সরকার ম্লান মুখে দোকান থেকে বের হয়ে আসে। পলি জিজ্ঞেস করল,

'কি দেখছিলে, চেয়ার?'

'হুম।'

'পছন্দ হয়েছে? খু-উব সুন্দর!'

'কিনলে না কেন?'

'অনেক দাম।' বলে হাঁটতে শুরু করে । ঘরমুখে।

একটি মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা জমায় মনি সরকার বেশ কিছুদিন ধরে। এবারও বেতন পেয়ে সেখানেও কিছু ভরে রাখে। পলি বলে,

'ভরেছে তোমার ব্যাংক?'

'একেবারেই না। যেমন আয় তেমন সঞ্চয়, এই যা।'

'আচ্ছা একটা কাজ করো না। এই ব্যাংকটা ভেঙ্গে তুমি ওই চেয়ারটা কিনে ফেল না।' না না। তা কি করে, এটা আমাদের বিপদে কাজে লাগবে।' মনির জোরালো আপত্তি। পলি হাসে। হাসতে হাসতে জানালার কাছে যায়। পর্দা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

পলি ডাকে, 'এ্যই, এদিকে এসো।'

'কেন?' মনি জিজ্ঞেস করে।

'দেখ কেমন ভরা পূর্ণিমা!'

'ওহো। তাইতো। আজ যে কোজাগরি।'

'কি বললে?'

'আজ শারদীয় পূর্ণিমা,মানে আজ কোজাগরি রাত।'

'তাই। তাহলে আমারটা কোথায়? দাও।' বলে হাত বাড়িয়ে দেয় পলি।

কি?

'আমার আজ রাতের কবিতা।'

'ও- আচ্ছা লিখছি।'

'কোন আচ্ছা-টাচ্ছা নয়। এখুনি বসো কবিতা লিখতে। শোন আজ কবিতার নাম দিও কোজাগরি। বসো বসো। আমি চা বানিয়ে আনছি।'

মনি হেসে বলে, 'পাগলী কোথাকার!'

সকালে মনি সরকার অফিসে ও অমি স্কুলে গেলে পলি ঘরে একা থাকে। পলি মাটির ব্যাংকটি ভেঙ্গে ফেলে। সেই টাকা এবং নিজের জমানো কিছু টাকা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়। সোজা গুলশানের সেই ফার্নিচারের দোকানে যায়। এটি ফিক্সড প্রাইসের দোকান। দামদর করা যাবে না। সেদিন মনির দেখা সেই পছন্দের চেয়ারটা পলি কিনে নিয়ে বাসায় আসে। ঘরের বিভিন্ন স্থানে চেয়ারটাকে রেখে দেখছে কোথায় এটাকে রাখা যায়। কিছুতেই স্থান পছন্দ হচ্ছে না। শেষে তার বেড রুমের জানালার পাশে শোবার খাটের মুখোমুখি চেয়ারটার উপযুক্ত স্থান মনেহল তার।

সন্ধ্যায় মনি সরকার ঘরে ফিরে তার নির্ধারিত ব্যাংকে কিছু টাকা রাখতে গিয়ে দেখে ব্যাংকটি নেই। কোথাও খুঁজে না পেয়ে পলিকে জিজ্ঞেস করলে পলি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। 'এদিকে এসো, এই চেয়ারে বসো।'

মনি অবাক হয়ে দেখে! সেদিন দোকানে দেখা তার পছন্দের চেয়ারটি তার সামনে। চেয়ারটি আসলেই তার খুব পছন্দ হয়েছিল। ভীষণ কিনতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু সব ইচ্ছাতো ইচ্ছে করলেই পূরণ করা যায় না। জিজ্ঞেস করে, তার মানে?'

'মানে এই। ব্যাংকটি আমি ভেঙ্গে ফেলেছি।'

পলি, ওই টাকাটা রেখেছিলাম বিপদে কিংবা প্রয়োজনীয় কোন কাজে লাগানোর জন্য।' আমার কাছে এই চেয়ারটা এখন বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। তুমি বসো বসো । আহা, একটু বসোই না আমি দেখি।'

পলি জোর করে মনিকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। তার কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরম আহ্লাদে বলে, 'জানো এই চেয়ারটা কোথায় রাখি তা বুঝতে পারছিলাম না। সবশেষে মনেহল এই খোলা জানালার পাশে এটা রাখাই উত্তম।'

'কেন মনেহল?'

'এই চেয়ারে বসে তুমি খোলা আকাশ দেখবে। বৃষ্টি দেখবে, জ্যোৎস্না দেখবে। আর আমি এই বিছানায় শুয়ে তোমাকে দেখবো।'

'আর?'

'আর প্রতিদিন তুমি আমার জন্য কবিতা লিখবে।'

'তুমি না আস্ত একটা পাগল।'

'আমি তোমার কাছে তা ই থাকতে চাই। বসো চা নিয়ে আসি।'

সকালে রান্না ঘরের কাজ করতে গিয়ে পলি অনুভব করছে তার কোমর থেকে তলপেটটা ব্যথায় কেমন যেন করছে। গতকাল দুপুরেও এই ব্যথাটা উঠেছিল কিন্তু পাত্তা দেয়নি। নিজেকে নিয়ে এত ভাববার সময় কোথায়? তাকে একাই সংসারের সব কাজ সামলাতে হয়। এদিকে অমিকে স্কুল থেকে আনার সময় হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে বের হল পলি। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার পথে পলি ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। অমি 'মা মা' করে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন ওদের রিক্সা ডেকে তুলে দেয়। পলি বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে আর উঠতে পারছে না। অমি আজ নিজের হাতেই ভাত খেয়ে নিয়েছে।

প্রতিদিনের অভ্যাসমত অফিস থেকে ফিরে মনি সরকার এই চেয়ারে বসে জুতা মোজা খুলে। পাশে থাকা পত্রিকাটা হাতে নিয়ে পড়তে থাকে আরাম করে। এ সময় পলি চা নিয়ে কাছে আসে। আজ পলিকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে ভাবল ক্লান্তিতে ঘুমুচ্ছে। তাই আর ডাকাডাকি করে না। পাশের রুম থেকে অমি ছুটে এসে জানায় আজ দুপুরে রাস্তায় পলির অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা। মনি সরকার দ্রুত উঠে যায় পলির কাছে। 'পলি কি হয়েছে তোমার?' পলি বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করলেও উঠতে পারছে না। তবুও মুখে বলে 'কিছুই না। ব্যথাটা কিছুক্ষণ পর এমনিতেই সেরে যাবে।'

'তার মানে মাঝে মাঝে ব্যথাটা হয়। আমাকে লুকিয়েছ? চল ডাক্তারের কাছে।' জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

ডাক্তার সব দেখে পরীক্ষা করে কিছু ঔষধ দিলেও টেস্ট রিপোর্ট দেখে জানায় সেই দুঃসংবাদটা। পলির দুটো কিডনিই অকেজো হয়ে গিয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে অতি শীঘ্রই একটি কিডনি অন্তত কিনে লাগাতে হবে। কিন্তু তাতে যে পরিমাণ খরচের হিসাব ডাক্তার দিলো তা মনি সরকারের সাধ্যাতীত। ভীষণ চিন্তায় পরে যায়।

বাসায় ফিরলে পলি জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরীতে ফিরলে যে?

ভাবছি এখন থেকে আরো দেরী করে ফিরবো।

মানে?

এখন থেকে অফিসে ওভার টাইম ডিউটি করবো। তখন রাত অন্তত বারোটাতো বাজবেই।

আচ্ছা, এমনিতেই তোমাকে সারাদিন পাই না। এখন অর্ধরাতটাও পার করে আসার মতলবে আছো। তা হবে না।

তোমার চিকিৎসা করাতে হবে না। অনেক টাকার প্রয়োজন। কেন যে তুমি ওই ব্যাংকটা ভেঙ্গে ফেললে।'

'আমার কিছুই হয় নি। কবিরাজ চাচার ঔষুধ খাচ্ছি । বেশ ভাল আছি।' মনে মনে মনি সরকার বলে, আমি জানি তুমি ভাল নাই পলি।'

এমনিভাবে মনি সরকার অর্থের সন্ধান করছে। দিনরাত অফিসে ওভারটাইম করছে। তারপরও তেমন অর্থের জোগান তেমন করতে পারছে না। এদিকে সে দেখছে দিনে দিনে পলির শরীর অবনতির দিকে যাচ্ছে। আজ প্রায় অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। রাতে কখন সে ফিরেছে পলি টের পায়নি। মনি একটু শঙ্কিত চিত্তে তার বিছানার পাশে গিয়ে বসে। আস্তে ডাকে, 'পলি, এই পলি।' কোন সাড়াশব্দ নেই। আস্তে গায়ে ধাক্কা দেয়। পলি হালকা স্বরে 'উম' শব্দ করে । 'তোমার শরীর খারাপ করছে?'

কে?

'আমি, পলি।'

'তুমি কখন এসেছ?'

'এইতো এসেছি।'

'চা খেয়েছ?'

'রাখ তো চা। তোমার কেমন লাগছে? ডাক্তার ডাকবো?'

'না। বেশ আছি। ঘুমে ছিলাম।'

তা জানি।' স্ত্রীর পাশে ঝিম ধরে বসে থাকে মনি।

পলি বলে, 'তুমি ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসো আরাম করো।'

'না থাক, আমি এখানেই বেশ আছি তোমার পাশে। পলি শরীরের ভেতরের যন্ত্রণা কিছুতেই মনিকে বুঝতে দিতে নারাজ। নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে কথা বলার চেষ্টা করছে।

'যাও না প্লিজ। তুমি চেয়ারে গিয়ে বসো।'

'কেন?'

'দেখ গিয়ে আজ কেমন পূর্ণিমা রাত! যাও তো।'

'পলি এখন তোমার পাগলামো রাখ।'

'বসো না প্লিজ।'

'এখানে বেশ আছি পলি।'

'আমার যে তোমাকে ওখানে বসে থাকা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। প্লিজ-।'

পলির অসুস্থ ক্ষীণ কণ্ঠের অনুরোধ মনি ফেলতে পারে না। উঠে গিয়ে চেয়ারে বসে। পলির মুখে তৃপ্তির হাসিরেখা ফুটে ওঠে। বিছানায় শুয়ে মনির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়। কিন্তু মনির বুকের ভিতর অস্থিরতা দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে পলি খুবই অসুস্থ। যেমন করেই হোক টাকার জোগাড় করতেই হবে কিন্তু এতগুলো টাকা সে কোথায় পাবে? এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ পড়ে পলির দিকে। পলি স্নিগ্ধ মুখে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে যেন চেয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু তার দৃষ্টি মনেহচ্ছে স্থির হয়ে গেছে। মনি দৌড়ে ছুটে এসে পলিকে ডাকে। 'পলি-পলি' দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। কোন সাড়া নেই। পলি নিথর হয়ে গেছে। পলি আর নেই। মনিসরকার আস্তে করে পলির চোখের দুটো পাতা বন্ধ করে দেয়। চিরনিদ্রায় চলে গেছে তার পলি।

দ্বিতীয় পর্ব
বিশ বছর পর

সকালে পেপার পড়া প্রায় শেষ করে ফেলেছে মনি সরকার। নাস্তার অপেক্ষায়। বাপবেটার সংসারে আজ নাস্তা বানানোর দায়িত্বে আছে পুত্র অমি। অমির বয়স এখন ছাব্বিশ। ওরা প্রতিদিন একসাথে নাস্তা করে একসাথে বের হয় অফিসের উদ্দেশ্যে। অমির অফিস গুলশানে আর মনি সরকারের অফিস পুরানাপল্টনে। দুপুরে দুজনই যে যার অফিসে লাঞ্চ সেরে ফেলে। বাবা মনিসরকার সাধারণত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে। তাই রাতের খাবার মনি সরকারই প্রস্তুত করে থাকে। অমি পড়ালেখা শেষ করে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে উচ্চপদের দায়িত্বে আছে। কোম্পানি মোটা অংকের বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন দেয় তেমনি অফিসে কাজের চাপও থাকে ভীষণ।

আজ অফিসে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। মনি সরকার হাঁক ছাড়ে, 'পেট পুরে যে ছাই হয়ে গেলরে অমি, নাস্তা হলো-?

'রান্না ঘরের ভিতর নাস্তা তৈরী করতে করতে অমি উত্তর দেয়।'

'এইতো এসে যাবে। একটু বসো বাবা।' বাবার এ্যাটেনশন ভিন্নখাতে নেওয়ার জন্য অমি বলে, 'শোন বাবা-, আজ সকালে তোমার লেখাটা পত্রিকায় পড়লাম।'

'পড়েছিস?'

'হু। দারুন লিখেছ।'

তাই নাকি? 'অমি দুহাতে দুটো প্লেট নিয়ে হাজির।'

'আজ স্পেশাল ডিম ভাজি করেছি। তাই দেরী হয়ে গেল। যা হয়েছে না, ডেলিশিয়াস!'

'নিজের প্রশংসা নিজেই করছিস? আগে আমি খেয়ে দেখি'

'দেখ দেখ, খেয়ে দেখ। মনি সরকার চামচ দিয়ে মুখে নেয়। অমির মোবাইল ফোনটা তখনই বেজে ওঠে। অমি ফোন নম্বরটা একটু দেখে পাত্তা দেয় না। বলে, 'কেমন হলো বলছো না যে।

মনি ইশারায় বলে, ফোন-।' রিং টোন বেজেই চলেছে।

অমি বলে, 'থাক। তুমি আগে বলো ডিমভাজিটা কেমন হলো?'

আগে ফোন ধর।' অনিচ্ছাসত্ত্বে বাবার আদেশে অমি ফোনটা রিসিভ করেই এক নিঃশ্বাসে বলে, ব্যস্ত আছি পরে কথা বলবো।'

'না, কোন ব্যস্ত নও তুমি। কথা শেষ করো আগে। অগত্যা ফোনটা নিয়ে বারান্দায় চলে যায় অমি। মনি হাসে। ফিরে এসে অমি আবারো জিজ্ঞেস করে, কেমন হয়েছে? ফোনটা কার?' অমি কোন জবাব দেয় না। ইতস্তত করে। মনিসরকার চোখ ইশারা করে জিজ্ঞেস করে, তার?' লজ্জায় অমি মৃদু মাথা ঝাঁকায়।

'ওকে ঘরে তুলে আনছিস না কেন আহাম্মক! তাহলে এসব অখাদ্য আর খেতে হবে না।'

'তুমি বলছো?'

'হ্যাঁ, আমিই তো বলবো।'

তাহলে তোমাকে যে ফারাহ্ -র আব্বা আম্মার সাথে কথা বলতে হবে।

'নিশ্চয় বলবো। তুই দিন তারিখ ঠিক কর।'

তার আগে তুমি ওকে একবার দেখবে না বাবা।

আরে তোর পছন্দই আমার পছন্দ। আমার ছেলের পছন্দ কি খারাপ হতে পারে।

'থ্যাংক ইউ বাবা।'

'শোন,'

'আবার কি?'

'ডিমভাজিটা বেশ মজার হয়েছে।'

'থ্যাংকস।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাই বেবি'

পরদিন অমিয় ফারাহকে তার বাবার সম্মতির কথা বলতেই বললো, 'তাহলে তো সব ফাইনাল। তোমাকে আমার বার্থডে পার্টিতে দেখে বাবা মা তো পছন্দ করেই বসে আছে। এখন আর দেরী করো না।'

'নিশ্চয় করবো না। তোমার বাবা-মা কে বলো আমরা কবে আসবো।'

বিয়ের পর অমির সংসার এখন পরিপূর্ণ। অমি একটা নতুন গাড়ি কিনেছে। অফিস থেকেও আর একটা গাড়ি দিয়েছে। তবুও মনি সরকার প্রতিদিন সাইকেলে চড়ে অফিসে যায়। অমি বাবাকে নিষেধ করেছে এই বয়সে আর সাইকেল না চালাতে। বাসায় একটা গাড়িতো পরেই থাকে। কিন্তু মনি সরকার বলে, সাইকেল চালালে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সেদিন নাস্তার টেবিলে বাবাকে বললো, বাবা এই বয়সে তোমার চাকরির কি প্রয়োজন? চাকরিটা এখন ছেড়ে দাও না।'

'চাকরি তো আমি পয়সার জন্য করি না রে বোকা। প্রতিদিন অফিসে যাওয়া - এটা আমার অভ্যাস।'

'তুমি তো গাড়িতেও চড়ো না। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা। কখন যে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসো।'

'জানিস, কিছু কিছু অভ্যাস আছে যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।'

'কিন্তু বাবা, তোমার বয়সটাও তো বিবেচনা করবে।

জানিস, ওটা ছেড়ে দিলেই বরং আমি বুড়ো হয়ে যাবো আমার কাছেই, রিটায়ার্ড করবো জীবন থেকে।' আবেগ প্রবণ বাবার সাথে অমি আর কথা বাড়ায় না।

কিছুদিন হলো অমি অভিজাত এলাকায় নতুন ফ্লাট কিনেছে। নতুন ফ্লাটে উঠে তার স্ত্রী ফারাহ্ নতুন সংসার গোছাতে রাতদিন ব্যস্ত। সুন্দর দামি দামি ফার্নিচারে বেশ পরিপাটি করে গুছিয়েছে ফ্লাটটি। সব কিছুই আধুনিক! নতুন ঝকঝকে কিন্তু এ বাড়িতে কেবল মনি সরকারের বসার চেয়ারটা খুবই পুরাতন, বড্ড সেকেলে। চেয়ারটা মনি সরকারের শোবার রুমে জানালার পাশে রাখা আছে। বাইরে থেকে এসে প্রতিদিন

চেয়ারে বসে বিশ্রাম করে। সকালে পেপার পড়া কিংবা নতুন লেখার কোন ভাবনায় এখানেই তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পার করে দেন। তার বর্তমান নিঃসঙ্গ গৃহকোণে চেয়ারটাই কেবল পুরাতন সাথী। এটা তার মৃত স্ত্রী পলির দেওয়া উপহার। এটা ঘিরে রয়েছে বহু সুখ-দুঃখের কাহিনী ও স্মৃতি। যদিও এ রুমে কেউ তেমন ঢুকে না। তবুও ঘর বাড়ি গোছগাছ করতে করতে ফারাহ দেখলো এতসব আধুনিক নতুন ফার্নিচারের পাশে এ চেয়ারটা বড়ই বেমানান লাগছে। ফারাহ্ কোথায় রাখবে এ জঞ্জাল! অমিকে কথাটা বলতেই বলল, 'আহা, একটাই মাত্র চেয়ার,থাক না পরে ওটা। তুমি ঘরের অন্য জিনিসগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ।'

ফারাহ খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের মেয়ে। অসম্ভব চুজি। তার প্রতিটা জিনিস হওয়া চাই আধুনিক, এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড আনকমন। এদিকে ফারার সব ফ্রেন্ডরা ধরেছে,নতুন ফ্লাটে উঠেছ, বাসায় পার্টি থ্রো করতে হবে।' বন্ধুদের আবদার মিটাতে আগামী পরশু সবাইকে আসতে বলেছে বাসায়। পুরোবাড়িটা আরো সুন্দর পরিপাটি করে গোছাচ্ছে।

কিন্তু মনি সরকারের চেয়ারটার গায়ে ঘুনও ধরেছে। ঝকঝকে সাদা টাইলসে ঘুনে ঝরা গুড়িগুলো ঝরে পড়ে। ফারাহ কাজের লোক ডেকে সেসব পরিষ্কার করায়। বন্ধুরা যদি এমনটা দেখে কি ভাববে তারা? ফারাহ কাজের লোককে হুকুম করে চেয়ারটা ঘর থেকে সরিয়ে নিতে।

মনি সরকার বাইরে থেকে এসে বাসায় প্রবেশ করতেই দেখেন একরকম সাজ সাজ ভাব পরে গেছে। তার বৌমা কাজের লোক নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত বন্ধুদের জন্য পার্টির আয়োজন করতে। কখনো খাবার মেনু ঠিক করছে বাবুর্চির সাথে। কখনো ফার্নিচারের ধূলাময়লা মোছার নির্দেশ দিচ্ছে। ফারাহর নতুন গৃহস্থালীর কাণ্ড-কারখানা দেখে মনিসরকার মনে মনে হাসে। তার নির্ধারিত রুমে ঢুকেন। প্রতিদিনের অভ্যাস মোতাবেক আরামচেয়ারে বসে কাপড় ছাড়তে গিয়ে দেখে চেয়ারটা নেই। এদিক সেদিক তাকিয়ে খুঁজে দেখে কোথাও নেই। কাজের লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ম্যাডামের নির্দেশে পুরানো চেয়ারটা সরিয়ে ফেলেছে। আর কোন কথা বাড়ায় না। জামা-কাপড়ও খুলতে ইচ্ছে হয় না। কোথায় বসে বিশ্রাম নেবে আজ। কিছুক্ষণ খাটের পাশে বসে থাকে। ভীষণ ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছে। চুপটি মেরে বিছানার কোনে শুয়ে পড়ে।

সন্ধ্যায় অমি অফিস থেকে ফিরে বাবার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে মনিসরকার বাইরের পরা কাপড় পরেই বিছানার উপর শুয়ে আছেন। ভাবতে থাকে কোথাও একটা সমস্যা নিশ্চয়। নইলে সাধারণত এরকম সন্ধ্যায় তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পেপার কিংবা বই পড়েন চেয়ারে হেলান দিয়ে। হঠাৎ লক্ষ্য করে জানালার ধারে বাবার চেয়ারটাও নেই। বুঝে নিতে কষ্ট হয় না নিত্যদিনের অভ্যাসে বাঁধা পড়েছে। সোজা গিয়ে ফারাহকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবার চেয়ারটা কোথায় ফারাহ?'

'আছে।'

'কোথায়?'

স্টোররুমে।' ফারাহ সুর কোমল করে বলে।

‘ওটা এনে রেখে দাও।’ অমির কণ্ঠ রাগান্বিত। ফারাহ কয়েকটা ঢোক গিলে বলে, ‘আমি বলছিলাম কি, কাল বাসায় পার্টিটা হয়ে গেলে ওটা এনে রেখে দেব নাহয়।’ ‘তাই যেন করো।’ বলে অমি চলে যায়। ফারাহ মনে মনে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। রাতে খাবার টেবিলে মনি সরকার আসে না। অমি এসে ডাকলে জানায় তার খেতে ইচ্ছে করছে না। চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন।

মাঝরাত পার হয়ে যাচ্ছে। অমির পাশে স্ত্রী ফারাহ বিভোরে ঘুমোচ্ছে কিন্তু তার ঘুম আসছে না। এখন শরৎকাল মাঝরাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। বাবা ঠিকমত ঘুমিয়েছেন কিনা তা দেখা দরকার। আজ অমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে তার বাবার মন ভাল নাই। তাই অভিমান করে রাতে খেতে আসেন নি। বুড়ো মানুষ ক্ষুধায় হয়ত কষ্ট পাচ্ছেন ভেবে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে বাবাকে দেখতে। ঘরে ঢুকে দেখে বাবা বিছানায় নেই । এদিক সেদিক চেয়ে দেখে জানালা দিয়ে শারদীয় জ্যোৎস্না ঘরের মেঝেতে ঢলে পড়েছে ঠিক যেখানে চেয়ারটা রাখা ছিল। সেখানেই মনিসরকার একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকিত ফ্লোরে চেয়ারশূন্য স্থানে মাথা গুঁজে গুটিশুটি মেরে বসে আছেন। তিনি ঘুম কি নির্ঘুম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাবাকে এমন নিঃসঙ্গ -অসহায় দেখে অমির বুকটা ভেঙ্গে আসে। দ্রুত গিয়ে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে। টেনে এনে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে বাবাকে দেখায়।

‘দেখ, তুমি কি করেছ!’ ফারাহ সব বুঝতে পেরে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। অমির চোখেমুখে ফারাহর প্রতি রাগ-ধিক্কার স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছে। তা দেখে সে শঙ্কিত।

অমি বলে, ‘চলো চেয়ারটা নিয়ে আসি স্টোররুম থেকে।’

‘কাল, কাল সকালে আমি এনে রেখে দেব।’

‘না, এক্ষুনি চলো। আমি নিয়ে আসছি।’ অমি স্টোররুমের দিকে যায়।

শোন, কিছু মনে করো না। চেয়ারটা আমি পুরানো ফার্নিচারের দোকানে দিয়ে এসেছি।’ ‘কি! কি বলছো তুমি!’

‘আমি ভেবেছিলাম ওটার বদলে বাবাকে নতুন সুন্দর দেখে আর একটা চেয়ার কিনে দেব।’

‘ফারাহ তুমি বুঝতে পারছো না কি তুমি করেছ।’

‘আমার ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দাও। প্লিজ। আই এম সরি।’

‘তুমি জানো না, বাবার ওই চেয়ারটাই প্রয়োজন। আমার মায়ের সকল স্মৃতি ভালবাসা ওই চেয়ারেই মিশে আছে। কাল সকালেই চেয়ারটা দোকান থেকে এনে বাবার ঘরে রাখবে।’

‘আচ্ছা।’

অপরাধীর মত ওরা দুজন ধীর পায়ে মনি সরকারের কাছে আসে। অমি আস্তে বাবার গায়ে হাত রেখে ডাকে ‘বাবা।’

‘হুম।’

‘চলো বিছানায় শুবে।’

‘এখানেই ভাল লাগছে।’

‘এমনিতেই এখন ঠাণ্ডা নামতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ঠাণ্ডা ফ্লোরে বসে আছো। অসুখ করবে যে।’

‘কিছু হবে না।’

‘ওঠো প্লিজ। কাল সকালে তোমার চেয়ার ফারাহ এনে এখানে রেখে দিবে। চলো বিছানায়।’ চেয়ারের কথা শুনে তিনি কিছুটা নরম হলেন। অমি বাবাকে ধরে ওঠায়। ‘তুমিত রাতে কিছু খাও নি বাবা। ফারাহ একগ্লাস দুধ নিয়ে আসো।’

ফারাহ দ্রুত একগ্লাস দুধ নিয়ে আসে। অমি নিজহাতে খাইয়ে বাবাকে বিছানায় শোয়ায়ে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দেয়। অপরাধবোধে, অনুশোচনায় আর লজ্জায় ফারাহর চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে।

সকালে উঠেই ফারাহ সেই ফার্নিচারের দোকানে যায়। কিন্তু দোকানী জানায় চেয়ারটা নেই। কালই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ফারাহ খবরটা অমিকে জানাতেই অমি দ্রুত দোকানে ছুটে আসে। অনেক অনুরোধ করে চেয়ারটা ফিরিয়ে দিতে কিন্তু দোকানী জানায় সে অপারগ। অমি লোভ দেখায় দ্বিগুন টাকা দেব। প্রয়োজনে যা চায় তাই দেবো। তবুও চেয়ারটা চাই-ই চাই।

যতবারই অনুরোধ করা হচ্ছে ততবারই ক্ষমা চেয়ে দোকানি বলছে কিছুতেই এখন আর সম্ভব নয়। অমি প্রশ্ন তোলে, ‘একটা চেয়ার দোকানে আসামাত্রই বিক্রি হয়ে যায় কি?’

‘স্যার, তাই হয়েছে।’

‘একটা পুরানো চেয়ার রঙ বার্নিশ ছাড়াই বিক্রি হয়ে গেল?’

ওই পুরানো চেয়ারটা অ্যান্টিক দেখে এক ফরেনার খুব পছন্দ করে সাথে সাথেই কিনে নিয়েছে। জানেনতো আজকাল পৃথিবীব্যাপী অ্যান্টিক যা মূল্যবান! শৌখিন বড়লোকেরা তো এগুলোই সংগ্রহ করে ঘরে সাজিয়ে রাখেন।

অমি ফিরে তাকাতেই ফারাহ্ ঢোক গেলে।

তবুও অমি হাল ছাড়তে রাজি নয়। সে বলে, ‘ওটা আমাদের খুবই প্রয়োজন আপনি সেটা বুঝেই হয়ত এমনটা করছেন। তাহলে সেই কাস্টমারের ঠিকানা দিতে পারবেন?’

‘আপনাদের রিসিটে নিশ্চয় লেখা আছে দেখুন প্লিজ।’ রিসিটবুক খুঁজে দোকানি জানায়, সরি, শুধু নাম ছাড়া আর কিছু লেখা নাই।’

‘তাহলে আপনাদের দোকানের যে ভ্যানে করে চেয়ারটা পাঠানো হয়েছে সেই ভ্যানওয়ালাকে বলুন আমার সাথে সেইখানে যেতে। সে নিশ্চয় চিনবে।’

‘সরি স্যার, ভদ্রলোকটি নিজের পিকাপভ্যান গাড়িতে ওটা নিয়ে গেছে।’ ওরা বুঝলো চেয়ারটা পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। হতাশ হয়ে দু’জনে ম্লানমুখে বাসায় ফিরে। রাতে মনি সরকারের গায়ে ভীষণ জ্বর আসে। ডাক্তারের সাথে কথা বলে অমি ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বাবাকে। জ্বর কমে গেলে অমি তার রুমে চলে যায়।

মাঝরাতে মনি সরকারের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। গায়ে আবার তার প্রচণ্ড জ্বরের তাপ। সেই জ্বরের ঘোরে চোখ মেলে দেখে খোলাআকাশ থেকে জ্যোৎস্নার আলো জানালা দিয়ে তার ঘরের ফ্লোরে পড়েছে। বিছানায় শুয়েই জোৎস্নার দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকে। দেখে সেই জ্যোৎস্নালোকের ভিতর দিয়ে আস্তে করে তার প্রয়াত স্ত্রী পলি হাসি মুখে এসে হাজির। মনি অবাক হয়ে উঠে বসে। অস্ফুট স্বরে, পলি!'

'তোমার ঘুম হচ্ছে না।'

মনি বলে, 'সত্যি। একদম না।'

হেসে জবাব দেয়, 'আমি জানি তুমি এখানে ভাল নেই। আর ভাল থাকবেই বা কি করে? আমি নেই, তোমার চেয়ার নেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি বলেছো তুমি।'

পলি হেসে বলে, 'তাইতো আমি চলে এলাম তোমাকে আমার সঙ্গে নিতে।' 'তুমি এসো।' পলি মনির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়।

'কোথায়?' মনি জিজ্ঞেস করে।

'এখানে। আমার কাছে।' মনি যেন সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে উঠে বসে।

'দেখ তোমার চেয়ারটা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'সত্যি বলছো?' মনি সরকার দেখে পলির সামনে জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে তার চেয়ারখানা। কেমন ঝলমল করছে। খুশিতে হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে। 'হ্যা, দেখ' তোমার চেয়ার। মনি ভীষণ খুশি।

পলি বলে, তোমার মত করে এখন আগের মত আকাশ, বৃষ্টি, জোৎস্না দেখতে পারছো না। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সেই সময় আর এখনকার এই সময়ের অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। এ সময় এখন ওদের। ওদেরকে ওদের মত করে থাকতে দাও। ওরা এগিয়ে যাবে নতুনের সন্ধানে-।

পলি বলেই যাচ্ছে। 'জানো, আমারও ভাল লাগে না তোমাকে এভাবে আর একা দেখতে। এসো, আমার কাছে এসো। বসো তোমার চেয়ারে। দেখ, আজ কেমন কোজাগরি রাত! জানো তো আজ শারদীয় পূর্ণিমার রাত। চলো,দুজনে একসাথে জ্যোৎস্না দেখবো।'

মনি উঠে পলির দিকে আসতে থাকে, 'আমি আসছি পলি।'

'এসো, তোমার চেয়ারে বসো।' পলি বলে।

মনি জ্যোৎস্নালোকের ভিতর প্রবেশ করে চেয়ারটাকে জড়িয়ে ধরে। চেয়ারে হাত বুলায়, আদর করে বার বার চুমু খায়। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পলি হাসছে সুখে। একসময় চেয়ারে মাথা রাখে মনি। পরম শান্তিতে চোখ বুঁজে আসে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই অমি দ্রুত ছুটে আসে বাবাকে দেখতে। দেখে বাবা বিছানায় নেই। সেই জানালার ধারে। জানালা দিয়ে এখন রাতের জ্যোৎস্না নয়, সকালের রোদ প্রবেশ করেছে। সেই রোদের মধ্যে চেয়ারবিহীন শূন্য ফ্লোরটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মনি সরকারের মৃতদেহ পড়ে আছে।

জননী বলে শুধু ডাকিব

সকাল আটটার ট্রেন বেলগাছি রেলস্টেশনে আসার আগেই রহিস উদ্দিন স্টেশনে পৌঁছায় তার সিদ্ধডিমের ঝুড়ি নিয়ে। একাজে সহযোগিতা করে তার স্ত্রী হরিতুন। প্রতিদিন কাক ডাকা ভোরে উঠে। ঘুম থেকে উঠেই ঘর বাড়ি ঝাড়ু দিয়ে উনুনে আগুন ধরায় হরিতুন। কারণ ভোরেই তাকে এক ঝুড়ি মুরগির ডিম সিদ্ধ করে গরম গরম ঝুড়িতে সাজাতে হয়। সেইসাথে লবণ আর শুকনো লংকার গুঁড়ো বোতলে ভরে দিতে হয়। ছোট টুকরো টুকরো কাগজগুলো সাজিয়ে প্যাকেটে ভরে ঝুড়ির মধ্যে রাখে। এরপর স্বামীর সকালের নাস্তা বেড়ে দেয়।

রহিস সকালে বের হয় আর ফিরে রাত আটটার ট্রেন স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবার পর। তার ছেলে অন্তু তখন ঘুমে থাকে। ছেলের সাথে তার খুব একটা দেখা হয় না। আজ সকালে নাস্তা খেতে বসে ছেলের কথা মনে পড়ে।

অন্তুর মা!' ডাকে রহিস। হরিতুন তখন লংকা পাটায় বাটছে।

'আমার নাম নাই? সে নামে ডাকন যায় না?' ঝেঁঝিয়ে উত্তর দেয় হরিতুন। 'হরিতুন, তুমিই তো এখন অন্তুর মা।'

'এমন দুস্য পোলার মা হওনের আমার কোন সাধ নাই।'

'কি বলো হরিতুন। অন্তুর মা মরে যাবার পর তোমারেই তার মায়ের দায়িত্ব নেবার জন্যি ঘরে আনছি। তুমিইতো ওর মা। ও একটু দুরন্ত, তুমি রাগ করো না। ছেলে মানুষ সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ওকে একটু শিক্ষা দীক্ষা দিও।' রহিস স্ত্রীকে বোঝায়। 'তোমার এমন বদ পোলারে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আমার নাই।'

হরিতুন স্বামীর প্রথমপক্ষের মৃত স্ত্রীর সন্তান অন্তুকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নাই। চিরাচরিত সৎ মায়ের ভূমিকায় হরিতুন জাজ্বল্যমান। বয়সেও হরিতুন রহিসের তুলনায় বেশ ছোট। সেটা রহিস হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে বউকে খুশি করার জন্য স্টেশন থেকে চুড়ি ফিতা কিনে প্রায়ই উপহার দেয়। তবুও হরিতুনের কঠিন মন অন্তুর প্রতি প্রসন্ন হয় না। সাত আট বছর বয়সের অন্তু ঠিকই বুঝতে পারে তাকে নতুন মা সহ্য করতে পারে না। ওর কারণে প্রায়ই নতুন মার সাথে বাবার ঝগড়া বাঁধে। তাইতো সে পারতপক্ষে নতুন মার চোখের সামনে আসতে চায় না। সারাদিন বাইরে বাইরে খেলাধুলা করে কাটায়। তার একমাত্র খেলার সাথী গোলাকার লোহার রিংয়ের চাটকি, যেটা একটা লম্বা চিকন সামনে বাঁকানো রডের হাতল দিয়ে ঠেলা দিলে সামনে গড়গড়িয়ে চাকার মত এগিয়ে চলে। চাটকি নিয়ে কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে হেঁটে সে দূর থেকে বহু দূরে চলে যায় একাকী মাঠ ঘাট প্রান্তর পেরিয়ে। সে সময়টা খুব ভাল কাটে তার। ইচ্ছে হয় সারাদিন এভাবে চাটকি নিয়ে থাকতে, শুধু ক্ষুধায় পেট চ্যাপ্টা হয়ে আসলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে হয়। রাতে ঘরে না ফিরে উপায় নাই, যাবে কোথায়। দেরীতে ঘরে এলে সৎমা বাবাকে নালিশ দেয়। উঠতে বসতে সমানে দোষ খুঁজে সৎমা। স্ত্রীর নালিশে অসহ্য হয়ে রহিস মা-মরা অন্তুর গায়ে বেশ কয়েকবার হাতও তুলেছে। প্রতিদিন মায়ের বকুনি খাওয়া তার বাঁধা রুটিন। বাড়িতে এসে অন্তু ভয়ে, সংশয়ে নতুন মায়ের কাছে খাবারও চাইতে পারে না। বাঁধো বাঁধো লাগে।

আজ সকালে ঘুমের মধ্যে অন্তু তার বাবা আর মায়ের কথোপকথনে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনে তড়িঘরি করে উঠে পরে। এখুনি বুঝি আবার ঝগড়া শুরু করে দেবে। ঝগড়া শেষে বাবা বাড়ির বাইরে চলে গেলে অমনি সৎমা সেই শোধ নিতে তার উপর চড়াও হয়ে আসবে। সেই আশংকায় আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে যায় তার প্রিয় চাটকী নিয়ে।

রহিস জিজ্ঞেস করে, 'অন্তু ঘরে নাই ?'

নাহ।

কই গেছে?

কি জানি।

স্কুল গেছে?

'তোমার গুণধর পুত্র স্কুলে যাওনের? চাটকি নিয়ে কোন মুলুকে গেছে দৌড়াতে।'
'কিছু খাইছে?' হরিতুন কোন উত্তর দেয় না।

অন্তু ঘর থেকে বের হয়ে লাঠির ডগায় ঘূর্ণায়মান চাটকি ধরে মাঠের আল পেড়িয়ে ইট বিছানো পথধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে একটি ট্রেন রেলস্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। সেও রেললাইনের পাশাপাশি পথ ধরে ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে সে আর ট্রেন এসে পৌঁছল স্টেশনে। অন্তু চাটকি থামিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতে লাগল। ট্রেনটা থামা মাত্রই স্টেশনটা কেমন চাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে। হৈ হুল্লোড়, চিৎকার, ডাকাডাকি, যাত্রীরা দ্রুত ওঠানামা করছে। কেউ কেউ জানালার ধারের সিটে বসার জন্য আগেভাগে বসে পড়ছে।

অন্তু দেখল ট্রেনের ভিতর বসা তার বয়সী একটি সুন্দর ছেলে। বেশ ফিটফাট পোষাক। মনেহয় শহুরে ছেলে। জানালার পাশে বসে ছেলেটি বাইরের স্টেশনের লোক সমাগম, কুলিদের যাত্রিব্যাগ ধরে টানাটানি, হরেক রকম ফেলিওয়ালাদের ভিড় সব দৃশ্যই চরম কৌতুহল নিয়ে দেখছে। পাশের ভদ্রমহিলা সম্ভবত তার মা। পেপার হাতে। জানালার কাছ দিয়ে চানাচুর, ঝালমুড়ি, বাদামওয়ালা, বুট, ছোলাভাজা, আইসক্রিম ইত্যাদি হাঁক দিয়ে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ঘনঘন। বোধহয় বাচ্চা ছেলেটিকে দেখে তাদের এই ঘনঘন আসা যাওয়া।

'এই ডিম- সিদ্ধ ডিম--।' অদ্ভুত আওয়াজে গলার গামছার সাথে বাঁধা ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রহিস উদ্দিন। সেই ছেলেটির সামনে জানালার কাছে গিয়ে রহিস দাঁড়ায়।

'ডিম গরম ডিম- খাবে বাবু?' ছেলেটি মৃদু মাথা নাড়িয়ে না সূচক ভঙ্গি করে।

অন্তু দূর থেকে তার বাবাকে দেখে আর এগোয় না। তবুও তার মুগ্ধদৃষ্টি সেই ছোট ছেলেটির দিকে। বালকটি দেখতে কেমন সুশ্রী! তার গায়ের জামাটাও সুন্দর। কেমন পরিপাটি করে মাথার চুলে সিঁথি কাটা। তার সাথে নিজেকে তুলনা করে। অন্তু নিজের অজান্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে চুল গুছিয়ে নেয়।

সে কখন বাড়ি থেকে বের হয়েছে। এরমধ্যে চাটকি নিয়ে খেলতে খেলতে স্টেশনের কাছে আসতে প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। এখন অন্তুও পেটে ক্ষুধা অনুভব করছে । ছেলেটির মা ডিমওয়ালার কাছ থেকে দুটো সিদ্ধ ডিম কিনল। সাথে কাগজে লবণ নিতে ভুল করল না। খোসা ছাড়িয়ে সন্তানের মুখে তুলে ধরেন মহিলা। বালকটি মুখ ফিরিয়ে খাবার অনীহা প্রকাশ করছে। কয়েকবার সাধাসাধি করে মা বলেন, 'খাও বাবা,পরে ক্ষিদে পাবে। সকাল থেকে কিছুই মুখে দিচ্ছ না।'

ছেলেটি এক কামড় দিয়ে বলে, 'আর খাব না।' মা তাকে খাওয়ানোর জন্য সেধে যাচ্ছেন।

অন্তু মনে মনে ভাবছে ছেলেটা কি বোকা! ওমন দশটা ডিম সে এখন একসাথেই খেতে পারবে। হয়ত বাবার পুরো ঝুড়ির ডিম এখন সে খেতে পারবে। ঝাল মুড়ি চানাচুর নানান সুরে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে অন্তুর সামনে দিয়ে। ইস্ । যদি তার কাছে পয়সা থাকতো তাহলে এ মুহূর্তে সে এখন সবই খেতে পারত। ট্রেনটা চলে গেল। রহিস উদ্দিনও ট্রেনে চড়ে বসেছে। এই ট্রেন ধরে এই লাইনে কোন এক স্টেশনে নেমে পড়বে আবার ফিরতি ট্রেনে চড়ে রাতে বাড়ি ফিরবে। প্রতিদিন সব ডিম যে বিক্রি হয়ে যায় তা নয়, সেগুলো আবার গরম করে পরেরদিন বিক্রির ঝুড়িতে ভরে নেয়। অন্তু পড়ন্ত দুপুরে বেশ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। পেটে বড্ড খিদে।

সেদিন হরিতুন ডিম সিদ্ধ করতে গিয়ে তিনটা ডিম ফেটে খোসা থেকে সাদা ভিতরের অংশ বের হয়ে গিয়েছিল। রহিস বউয়ের উপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল সেদিন। অন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে ফাটা ডিমগুলোর একটা আজ তার পাতে পরবে।

কিন্তু তা হয়নি। রহিস একটু কম মূল্যে চটপটি বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তার পাতে জুটেছে শুধু আলু ভর্তা।

আজ স্টেশন থেকে ফিরে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে তার। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। হরিতুন কিছুতেই খাবার দিচ্ছে না। রান্না ঘরের আশেপাশে ঘোরা-ফেরা করছে। তবুও ভয়ে মুখ ফুটে ভাত চাইছে না।

সৎ মায়ের কাছে ভাল ছেলে সাজার জন্য গোসল সেরে আসে। তবুও হরিতুনের খাবার দেবার কোন লক্ষণ নেই। এক সময় সইতে না পেরে সংকোচ ভেঙ্গে সে নিজে বলে, 'ক্ষিদে পাইছে মা।'

অমনি হরিতুন চেচিয়ে ওঠে, 'ক্ষিদে লাগছে সিধে হয়ে বসে থাক। আমার কাম শেষ হলে খাবার পাবি। আর শোন, খবরদার আমারে মা বলবি না। এত বড় ডাঙ্গর ছেলের মুখে মা ডাক আমার ভাল্লাগে না।'

একটি থালায় ভাত এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নে খা। কিন্তু খাওয়ার পর এই কাগজগুলো কেটে সুন্দর করে ভাঁজ করে ঠোঙ্গায় ভরে রাখবি কলাম।'

এক গাদা খবরের কাগজ তার সামনে হরিতুন দিয়ে চলে গেল। ক্ষুধার্ত অন্তু গোগ্রাসে খাবারগুলো আগে খেয়ে ফেলে। এরপর কয়েকটা কাগজ নিয়ে ভাঁজ করে কাটে কিন্তু অন্তুর এখন ঘুম পাচ্ছে। বড্ড ঘুম। বহুপথ হেঁটেছে, সে ক্লান্ত। ভেতোঘুম ধরেছে।

'ওরে হারামজাদা। ভাত গিলেই পরে পরে ঘুমাচ্ছিস। দাঁড়া তোকে ঘুম পারাচ্ছি।' হঠাৎ হরিতুনের চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গে অন্তুর।

ওমনি তড়িঘড়ি করে উঠে। দৌড়ে বাড়ি থেকে পালায় কিন্তু যাবার সময় চাটটি সাথে নিতে ভুল করে না।

চাটকি গড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার স্টেশনের পাশ দিয়ে রেল লাইনের পথে। কাদামাটি, ধুলাবালি স্টেশনের থুতু, কাঁশি, চুইংগামের আঠা গায়ে জড়িয়ে তার হাতের চাটকি গড়িয়ে চলে। এ গোলাকার চাটকিই একমাত্র পথচলার সাথী, সুখে দুখে পরম বন্ধু। তার সময় কাটানোর সঙ্গী। চাটকি এগিয়ে চলে সামনের দিকে কিন্তু মনে মনে বাড়ি ফেরার ভয়! সৎ মায়ের আদেশ পালনে ব্যর্থ হবার ভয়! মায়ের নালিশে বাবার পিটুনীর ভয়! নানান রঙের ভয় ভিড় করছে চারপাশে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। মন চাইছে না বাড়ি ফিরতে। এত বড় পৃথিবীতে তার নিরাপদে রাত কাটানোর এতটুকু স্থান নাই। আবারো ফিরতে হবে সৎমায়ের ঘরে। যেখানে নেই আদর, স্নেহ-ভালোবাসা। তিরস্কার ভর্ৎসনা আর বকুনীতে ঠাসা গৃহ। ফেরার পথে বাড়ির পাশের গাছতলায় বসে চাটকি পরিষ্কার করতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল চাটকির সাথে একটি ভাঁজ খাওয়া কাগজ আঠার মত লেগে আছে। সে কাগজটি খুলে ফেলতে গিয়ে দেখে এটি কোন সাধারণ কাগজ নয়, এটি টাকার নোট। কাগজটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখে। সত্যিই তো! পুরো এক হাজার টাকার নোট! এবার নোটটির ধুলো ঝেড়ে পকেটে নিল। অন্তু চুপ করে ঘরে ফিরে জাপটি মেরে বিছানায় গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকে।

এত খুশি এত আনন্দ! রাতে টাকার ভাবনায় ঘুম আসছে না। ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এতগুলো টাকা! তা দিয়ে কি করবে সে? এতগুলো টাকার একমাত্র মালিক এখন সে!

মালিকই তো। এ ভাবনাতে কোন দোষ নেই কারণ টাকাটা তার ভাগ্যেই জুটেছে। ইচ্ছা করলেও আসল মালিককে সে ফিরিয়ে দিতে পারছে না। সে তো চুরি করেনি যে দোষের টাকা হবে। সে ভিক্ষাও করেনি যে অপমান বোধ করবে। কিছুতেই কূল কিনারা ভেবে পাচ্ছে না এই টাকাটা কীভাবে সে ব্যয় করবে। বারবার প্যান্টের পকেটে সাবধানে হাত দিয়ে দেখে নেয় টাকা এখনও তার কাছে আছে কিনা।

উল্লসিত মনে ভাবছে কি করবে এখন এতগুলো টাকা দিয়ে? ভাবছে তার সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটা কিনবে। অনেক! অনেক কিছুই তার পছন্দের। মুহূর্তেই তার সারাজীবনের সব সাধ আহ্লাদ একত্রে এসে বাসা বাঁধল। সে প্রথমে শহরে যাবে সেই ট্রেনে বসে থাকা বালকটির মত সুন্দর একটা জামা কিনবে। নিজের মনের আয়নায় নিজেকে পরিপাটি সিঁথিকাটা সুন্দর শহরের ছেলের রূপে দেখতে পেয়ে মনে মনে লজ্জা পেল যেন।

আবার ভাবে, না থাক। বাজারে গিয়ে এ টাকা দিয়ে দোকানের সবগুলো চকলেট কিনে এনে সারাদিন শুধু চকলেট খাবে। আবার মত পাল্টিয়ে ভাবে স্টেশনের পাশে সগিরচাচার দোকানে লম্বা মালার মত ঝুলিয়ে রাখা দোকানের সব চিপস কিনে এনে ঘর ভর্তি করে রাখবে আর খাবে।

আবার ভাবে আইসক্রিমওয়ালার পুরো আইসক্রিমের বাক্সটা কিনে একা একা খাবে। সারারাত ধরে নানান পরিকল্পনা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

রাতে তার বাবা হরিস বাজার থেকে কাচা ডিম কিনে এনে কখন বাড়ি ফিরেছে অন্তুর জানা নাই। সকালে অন্তুর ঘুম ভাঙ্গে হরিতুনের বিকট চিৎকারে।

'হায় ! হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! একি হলো!'

অন্তু ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে ওঠে। সন্তর্পণে দরজায় গিয়ে দেখে হরিতুন চুলোয় আগুন জ্বালিয়েছে মাত্র ডিমসিদ্ধ দেবার জন্য। পাশে উঠোনে কাঁচা ডিমের ঝুড়ি উল্টিয়ে দিয়েছে বিড়াল আর কুকুরে মারামারি করে। সব ডিম ভেঙ্গে গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হরিতুন ভাঙ্গা ডিমগুলো তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই আর অবশিষ্ট নাই যা নিয়ে আজকে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করতে পারবে। এদিকে রহিস বাড়ি নাই, গেছে পাশের বাড়ির পুকুরে গোসল করতে। বাড়ি আসলে কি করবে আজ হরিতুনকে। ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে। হয়ত পিটিয়ে আজই বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এতগুলো ডিম যে নষ্ট হয়ে গেল। এর বিক্রির টাকা থেকে তো রোজরাতে বাজার করে আনে রহিস, যা দিয়ে প্রতিদিনের সংসার চলে। কি হবে এখন? হরিতুন কিছুই চিন্তা করতে পারছে না।

বিমূর্ষ হরিতুনকে দেখে মুহূর্তেই অন্তুর মাথায় কি যেন খেলা করল। সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হরিতুন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। নিজেকে আর থামিয়ে রাখতে পারছে না হরিতুন। চুলায় পানি ফুটছে টগবগিয়ে। চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পর অন্তু বাড়ি ফিরে এলো এক ঝুড়ি ডিম নিয়ে। আস্তে করে হরিতুনের পাশে রেখে দিয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হরিতুন হঠাৎ পাশ ফিরে দেখে নতুন একঝুড়ি ভর্তি ডিম। সে অবাক! কি করে সম্ভব ? পিছনে তাকিয়ে

দেখে অন্তু দরজার পাশ ধরে দাঁড়িয়ে কেমন মিষ্টি চাহনি মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। হরিতুন বুঝতে পারে কাণ্ডটা তারই। ছুটে যায় অন্তুর কাছে।

'কোথায় পেলি এতগুলো ডিম?'

'দোকান থেকে।'

'চুরি করে এনেছিস?'

'না আমি কিনেছি।'

'কোথায় পেলি টাকা?'

অন্তু গতকালের সব ঘটনা খুলে বলে। শুনে হরিতুন তাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরে। 'তোকে আমি বুঝতে পারি নাই রে। তুইতো ছেলে না একটা আস্ত সোনার টুকরো।' অন্তু নতুন মায়ের বুকে মাথা রেখে বলে, 'আমি সোনার টুকরো হতে চাই না। শুধু তোমার ছেলে হতে চাই। তোমাকে মা বলে ডাকতে চাই। বলো, তুমিই আমার মা?'

হরিতুন চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারে না। অন্তুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে।

শৈলজা সুন্দরী

সোমনাথ সে সময়ে আদৃত হয়েছিল ঋষিপল্লীতে তার মহান সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। শুধু সিদ্ধান্ত নিয়েই নয়, সে সময়ে বেশ ঘটা করেই আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়েই পূরণ করেছিল তার মনোবাসনা। চারদিকে বাহবা বাহবা ধ্বনিতে সেসময়ে সমাদৃত হলো কালীভক্ত সোমনাথ। দেবী সেবায় উৎসর্গ করেছিল নিজ কন্যা শৈলজা সুন্দরী রানীকে। সংসারধর্ম করলে দেবীসেবা বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে মন্দিরের পাশে দণ্ডায়মান বটবৃক্ষের সাথে কন্যাকে বিবাহ দেন। আর ভালোমন্দ কিছু বোঝার আগেই সোমনাথের কৃষ্ণবরণ শিশুকন্যা শৈলজা শাখাসিঁদুর পরে কালীসেবী বলে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। কালীসেবায় মেয়েকে উৎসর্গ করতে পেরে পরম-তৃপ্ত সোমনাথ। তারপর থেকেই শৈলজা নদীর ধারে মন্দিরের পাশে দণ্ডায়মান সিঁদুর-চন্দন চিত্রআঁকা বিশাল বটবৃক্ষকে রোজ পূজা করে স্বামীদেবতারূপে। আর মন্দিরের অভ্যন্তরে মা-কালীর পরিচর্যা ও সেবা করে, যেমন করে আসছে সে তার জ্ঞান বৃদ্ধির পর থেকেই। এখনো মধ্যবয়সী এই রমণীকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে লম্বা জিহ্বায় পান খাওয়া দাঁতের কামড় বসিয়ে বলে 'শৌহরের নাম নিতে নেই।' যদি বটবৃক্ষ দেখিয়ে বলা হয় 'এটা কি গাছ?' সে লজ্জা পেয়ে হেসে দেয়। কিছুতেই করে না উচ্চারণ। শৈলজার আশেপাশের হিন্দুবসতিরা সব একে একে পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ত্যাগ করায় এক সময়ের জনবহুল এই ঋষিপল্লীর আকৃতি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর খর্বাকৃতির ঋষিপল্লীটা মাত্র একটি ঋষিবাড়িতে পরিণত হয়েছে। তবে গ্রামটি আর সেই আগের মত নিঝুমপল্লী নেই। ঋষি সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে এলেও অন্যান্য মানুষের বসতি অনেক বেড়েছে।

ঘনজঙ্গলে ছেয়ে গেছে ঋষিবাড়ির চারধার। শৈলজার বাবা সোমনাথ এখন আর বেঁচে নেই, নেই তার কোন নিকট আত্মীয় স্বজনও। সবাই এইদেশ ছেড়ে চলে গেছে। ওপারে যাবার জন্য তাকেও সবাই বলেছিল। কিন্তু সে রাজি হয়নি। কারণ এখানে সে

একা নয়, রয়েছে তার স্বামী দেবতা বটবৃক্ষ। প্রতিদিন ভোরে নদী থেকে স্নান সেরে এসে তীরে দণ্ডায়মান বটবৃক্ষের পূজা করে। পূজা শেষ হলেই ঘরে এসে প্রাত্যহিক কর্ম শুরু করে। এর মধ্যে প্রধান কাজ হচ্ছে নদী আর বাড়ির মাঝামাঝি অবস্থানে কালীমন্দির। সেটার আঙিনা ঝাড় দেওয়া পরিষ্কার করা, আলামাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপন করা, দেবীর ভোগ দেওয়া, সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি। তাইতো সে কীভাবে যাবে ওপার বাংলায়। আর স্বামী দেবতাকেই বা কীভাবে সঙ্গে নিয়ে যাবে। মন্দিরের সেবাই তার জন্ম-জন্মান্তরের কাজ।

মন্দিরের পাশেই শৈলজার কুঁড়েঘরখানি। ওদের সব জায়গাজমি যে ওর আত্মীয়রা বিক্রি করে গিয়েছে তা নয়। বাড়ির জমিতে তো কেউ হাত দেয়নি। বরং ওরা দিয়ে গিয়েছে দেবীসেবী শৈলজাকে কিন্তু এখন তার মুসলিম প্রতিবেশিদের জমি দখল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাড়তে বাড়তে চলে এসেছে শৈলজার ঘরের দোরগোড়ায়। প্রতিবাদ করতে পারেনি বরং ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে বাবা-দাদার ফসলি জমি, গাছ গাছালি। মনে ভাবে একার সংসারে কতটুকুই বা তার প্রয়োজন। তবুও শেষ ইচ্ছা, যেন স্বামীদেবতার শীতল ছায়ায় তার চিতাভস্ম রাখা হয়।

শৈলজার এতটুকু আঙিনা ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে করে রেখেছে। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। সামনে একটুকরো উঠোন। উঠোনের অপর প্রান্তে কিছু ফুলগাছ। সন্ধ্যামালতী, গাঁদাফুল ও চাঁপাফুলগাছ আছে। পাশেই বিশাল বেলগাছ। গাছের নিচে খোলা একচালা ঘর। তার ভিতরে একপাশে ঢেঁকি আর উনুন। মাঝবয়সে এসেও শৈলজা এই ঢেঁকিতে চাল ভানে চিড়া কুটে একাই।

বাড়িতে তেমন লোক চলাচল না করার কারণে এক সময়ের ইট বিছানো মন্দিরে যাবার রাস্তা আগাছায় গেছে ঢেকে। সন্ধ্যায় ভাঁটফুলের তীব্র গন্ধ ছেয়ে যায় আশপাশ। শৈলজা মন্দিরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসে। কেমন নির্ভীক সাহসী সে! কেউ কেউ বলে ওর ঘাড়ে ভূত আছে নইলে কি এমন একা একা কেউ থাকতে পারে?

কিছুদিন হলো তার কাছে আশ্রয় নিয়েছে এক দূরসম্পর্কীয় ভাগিনী মহিমা। সে খুব কম বয়সে বিধবা হয়েছে। অষ্টাদশীর কাঁচা বয়সের মায়া লেগে আছে সর্বাঙ্গে। মহিমাকে বিয়ে দিয়ে ওর বাবা-মা ভারত চলে গেছে তাদের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রি করে। মেয়ে জামাইকে পণের মোটা অংকের টাকাও পরিশোধ করে গিয়েছে কিন্তু মহিমার কপাল মন্দ। স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুরবাড়িতে তার সমাদর কমেছে। একপ্রকার মনঃকষ্টে সে এসেছে মাসির কাছে।

মহিমা আসাতে শৈলজার ভালই হয়েছে, নইলে এ বিরান-বাড়িতে তাকে একাই চৌপ্রহর কাটাতে হত। ওর শ্বশুরকুলের সবাই থাকে এপারে। কিন্তু সেই যে মহিমা শৈল মাসীর কাছে এসেছে, আর তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ কোন খোঁজখবর নিতে আসেনি।

শৈল দেবী-সেবার পাশাপাশি জীবিকার জন্য কাজ করে। এ কাজে তার সুনাম আছে। নিজহাতে চিড়া, মুড়ি, খৈ বানিয়ে দেয়। অর্ডারে মানুষের বাড়ি থেকে ধান মেপে দেয় শৈলজাকে। সেই ধান ঝেড়ে বেছে ঢেঁকিতে মাড়িয়ে চিড়া বানিয়ে পৌঁছে দেয় তাদের। এর বিনিময়ে নির্ধারিত পরিমাণে ধান সে পায়। এভাবে তার একার পেট চলে যায় কোনমতে। নেই কোন সাধ-বিলাসের আধিক্য। গ্রামে কোন বাড়িতে

বিয়েসাদী বেঁধে গেলে শৈলজার চিড়া ভানার অর্ডারও বেড়ে যায়। মহিমা আসাতে তার সুবিধা হয়েছে। রাতে কুপির আলোয় দুই মাসী-ভাগিনীতে মিলে জোড়পায়ে ঢেঁকি চালায়। দিনের বেলায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়।

মোল্লাবাড়ির ছোটছেলের মুসলমানি। শহর থেকে আত্মীয়স্বজন আসবে বাড়িতে। কত রকম আনন্দ ফুর্তি চলবে কয়েকদিন। শৈলজাকে বাড়িতে ডেকে গৃহিণী মুড়ি আর খৈ ভাজার অর্ডার দিয়েছেন। বিন্নী ধানের চাল দিয়েছেন মেপে। শৈলজা মহিমাকে নিয়ে মুড়ি ভেজে মোল্লাবাড়ি পৌঁছে দিতে যায়। বাড়ি ভর্তি শহুরে আত্মীয় স্বজন এসে গেছে। লোকজন গল্প আড্ডায় মশগুল। বাইরের উঠোনে একদল যুবক টেবিলে কেরাম খেলছে।

ডোলাভরা মুড়ি নিয়ে বাড়িতে আসে ওরা। মোল্লাসাহেবের বড়ছেলের বন্ধুরা শহর থেকে এসেছে। মহিমার দিকে ওদের দৃষ্টি। বারবার আড় চোখে কেমন করে যেন তাকায়। মলিন বসনে মহিমা নিজেকে লুকায়। কি যেন বলাবলি করে আর হাসাহাসি করছে।

বিকেলে শৈলজা নদীতে পানি আনতে গেলে মহিমা ঘর ঝাড় দিচ্ছিল। এমন সময় দু'জন যুবক বাড়িতে আসে। এদিক সেদিক তাকিয়ে ঘরের দিকে আসছে। মহিমা ওদের চিনতে পারে মোল্লাবাড়িতে দেখেছিল ওদের। বখাটে স্বভাবের। নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে আসে। দেখে একটু দূরে বাড়ির পাশে আমগাছ তলায় আড়ালে মোল্লার বড় বেটা দাঁড়িয়ে। মহিমা বুঝতে পারে সেই তার বখাটে বন্ধুদের এ বাড়ি চিনিয়ে এনেছে। এটা জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট একটা-বাড়ি। সাধারণ মানুষের চলাচলের সীমানার বাইরে। আশে পাশে তাদের কোন প্রতিবেশী নেই। মুসলমান বাড়িগুলো বেশ দূরে। এক যুবক মহিমার দিকে অশ্লীল ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, 'বাহ্, কী সুন্দর দেখতে।'

'কি চান আপনেরা?'

'তোমারে। দেখতে আসছি।'

'আমিতো আপনাদের চিনি না।'

'আমরা তোমারে চিনি। তোমারে দেখার পর থেকে মনের মধ্যে বসাইয়া রাখছি তোমারে।'

'কেন আসছেন?'

'বলি, তুমি আমাদের বসতে বলবা না। ঘরের মধ্যে গিয়ে একান্তে বলি?' বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে মহিমা। তার চক্ষুদ্বয় রাগে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। 'আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি।'

যুবকদের কু-মতলব মেয়েটি জল আনতে ঘরে ঢুকলে ওরা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবে। কিন্তু দরিদ্র এ কুঠুরিতে বারান্দায় মাটির কলসীতে পানি ছিল। কাঁসার থালা গ্লাস একটু আগে মেজে ধুয়ে বারান্দায় ছড়িয়ে রেখেছে। ওখান থেকে গ্লাসে করে পানি ঢেলে দিল। পানি নিতে গিয়ে ওর হাতটা ধরে বসে।

'আহা, পরানতো জুড়াইল না।' বলে টানাহেঁচড়া শুরু করে।

'ছাড়েন কি করছেন।' মহিমা চিৎকার দিয়ে ওঠে । 'মা- সী-- !' এরই মধ্যে শৈলজা বাড়িতে প্রবেশ করেছে।

'কে রে ?' হেঁকে ওঠে।

'পানি খেতে চাইছিলাম মাসি।' বলেই বখাটেরা দ্রুত কেটে পরে।

মহিমা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। শৈলজা মাসীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

বিকেলে মোল্লাবাড়িতে শৈলজা গিয়েছিল কিন্তু ঘটনাটা গিন্নীকে জানাতে পারেনি তার ব্যস্ততার কারণে। ফেরার পথে মোল্লার ছেলে পথ আগলে ধরে।

'এই দিকে কই গিয়েছিলা? নালিশ দিতে? তাইলে কামটা ভালা হইবো না কইলাম।' 'কি করবা তুমি?'

'নদীর পারে তোমার বাড়িটা আমার বন্ধুদের খুউব পছন্দ হইছে। গ্রামে যুবকদের খেলাধূলার ক্লাব ঘর নাই। ওরা ঠিক করছে ওইখানে যুব-ক্লাব বানাইবো। নদীর ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাইয়া তোমার উঠানে কেরাম খেলব।'

'সেইটা আমি কখনো হইতে দিবো না। তাইলে তোমার বাপের কাছে গিয়া সব বইলা আসি।'

শৈলজা আবার মোল্লাবাড়ির ভিতর ঢুকে। মোল্লাকে এবার তার ছেলে সম্পর্কে নালিশ দিতে হবে। ভিতরে আত্মীয়-স্বজন ভর্তি। রান্নাবান্না চলছে হাড়ি ভর্তি করে। গরু জবাই করে মাংস কাটাকাটি চলছে। ত্রিপল-সামিয়ানা বিছানো হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত। কোথায় মোল্লা সাহেব শৈলজা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ মনেহল একা বাড়িতে মাহিমাকে এতক্ষণ একা রেখে আসা ঠিক হয়নি। দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হয়।

বাড়ি ফিরে দেখে মহিমাকে নিয়ে টানাটানি করছে সেই বখাটেরা। তার উপস্থিতিতে সরে পরে। ভয়ে মহিমা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। শৈলজা ভাবে আর সহ্য করা নয়। এবার গ্রামবাসীরে জানাবে মোল্লাবেটার কাণ্ড। শৈলজা দ্রুত বের হয় নালিশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু মন্দির পর্যন্ত আসতেই বোখাটেরা তাকে জাপটে ধরে।

'শুনছি তুই কুমারী আছস। আগে তোর তেজ কমাই দিই।' বলে মন্দিরের পাশে ঝোঁপের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় শৈলজাকে। তার উপর আছড়ে পড়ে এক দল হিংস্র শকুনের থাবা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে মহিমা মাসিকে ডাকছে। পৈশাচিক উল্লাসে হায়ানার দল। মাসি মাসি চিৎকার করছে মহিমা। তার মাসি ধর্ষিত হচ্ছে। পাণ্ডবদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। যে ভিটামাটি ছেড়ে ওপারে গেল না স্বামী দেবতাকে ফেলে। আজ মন্দিরের পাশেই তার বটবৃক্ষ শৌহরের সামনে ধর্ষিত হলো এই মাঝবয়সে । অপমানে লজ্জায় ক্ষোভে জ্বলছে শরীর। কার কাছে দেবে নালিশ? কিশোরী বয়সে পাকবাহিনীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে। আজ মধ্যযৌবন পেরিয়ে স্বাধীনদেশে প্রায় সন্তানতুল্য যুবকদের কাছে রক্ষা মেলেনি তার।

শৈলজা মহিমাকে সে রাতেই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। চলে আসে মন্দিরের কাছে। তাকে এবার কিছু একটা করতেই হবে। কাজটা সম্পন্ন করে।

তারপর যায় পতিদেবতার কাছে। যা ছিল তার শেষ আশ্রয় শেষ ঠিকানা। রাতের আঁধারে বটগাছের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করে শৈলজা।

ভোরে লোক সমাগম মোল্লাবাড়ির অভ্যন্তরে। মোল্লার বড়ছেলে নিহত হয়েছে। তার বুকের এপাশ ওপাশ ফুরে আছে মন্দিরে থাকা কালী দেবীর হাতের মস্ত ত্রিশূল।

শাওন ধরাতলে

আজ হঠাৎ খেয়াল করেন মহিত সরকার ফেসবুকে তার ফ্রেন্ডলিস্টে একটি নতুন নাম সংযোজিত। নামটি তার খুবই পরিচিত কিন্তু কীভাবে এলো এই নামটা! ঠিক মনে করতে পারছেন না কখন এই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা একসেপ্ট করেছেন কিংবা এই নামের কাউকে কখনো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন কিনা। তার ফ্রেন্ডলিস্টটা খুবই সীমিত আকারের।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর মহিত সরকারের বেশির ভাগ সময় কাটে ফেসবুকে। এই একাউন্টটা খুলেছেন তিনি তার একমাত্র প্রবাসী ছেলে মাহিরের পরামর্শে। ষাটোর্ধ্ব বয়সে একাকিত্ব ঘোচানের উত্তম পন্থা। ছেলের সাথেও স্কাইপে কথা হয় মাঝে মাঝে তবে তা খুবই নির্ধারিত সময়ের জন্য। বিপত্নীক মহিত বাকিটা সময় ঢাকার ফ্লাটবাড়িতে একা একা কাটান। তার ল্যাপটপে ফেসবুক অন থাকে সবসময়। ঘুরেফিরে নোটিফিকেশনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন।

তার কাছে অদ্ভুত লাগছে পুরো ব্যাপারটা! বুঝতে চেষ্টা করেন এই নামটি তার পূর্বপরিচিতা সেই মেয়েটির কিনা। গ্লোরি। নামটি তার প্রিয় নাম। যে নামটি একদিন তিনিই দিয়েছিলেন তাকে। তাই উৎসাহবশত সেই নতুন ফ্রেন্ড-এর প্রোফাইল ওপেন করেন। মহিত সরকার প্রোফাইলটা আদ্যোপান্ত তড়িঘড়ি করে পড়ে ফেলেন। কে এই মেয়েটি? এ কি সেই গ্লোরি ? তা কি করে হয়? ফেসবুকের কোথাও গ্লোরির কোন ছবি খুঁজে পেলেন না। হোম এড্রেসটা এবার ঠিকমত পড়লেন। জয়ন্তিকা, পার্বত্য এলাকা।' ঠিকানাতো হুবহু এক। জয়ন্তিকা এলাকায় একসময় তিনি থাকতেন, সেখানে গ্লোরির থাকত। গ্লোরির ফেসবুক ওয়ালে তেমন কিছু পোস্ট করা নেই। শুধু মাসকয়েক আগে সে স্ট্যাটাসে লিখেছে 'গান ভালবাসি। গান শুনতে চাই।'

আশ্চর্য! এই কয়েক মাসে কেউ তাকে কোন গানও পাঠায়নি। এমনকি স্ট্যাটাসে একটা লাইক পর্যন্ত দেয় নাই কেউ। তবে কি মেয়েটির কোন বন্ধু নেই?

পরক্ষণে ভাবতে থাকেন 'সে তো লেখাপড়া জানত না। আজ এত বছর পরে গ্লোরি কীভাবে ফেসবুকে আবির্ভাব হবে? ছিল একবারে গেঁয়ো গোমূর্খ কিন্তু গান শুনতে খুব ভালবাসত। মাঝেমাঝে গুনগুনিয়ে গাইত। চমৎকার গলাও ছিল! মহিত বহুবছর আগে জয়ন্তিকায় বদলি হয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরির শুরুর দিকে। পার্বত্য এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে ছিল তার বাসস্থান।

সেখানে তখন নির্জন অপরিচিত স্থানে নিজেকে খুব একা একা লাগত। ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য বাগানের মালি বীরুলাল প্রসাদকে একটি কাজের মানুষ জোগাড় করে দিতে বলেন। পরদিন সকালে বীরুলাল একটি তেরোচৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরীকে নিয়ে হাজির।

বাবু, এ আমার বেটি আছে। ও তোয়ার সবকাজ করে দিতে পারবেক।'

মহিত একটু বিব্রতবোধ করছিল। মেয়ে! তোমার মেয়ে!

হুম।

আমি ভাবছিলাম যদি কোন বয়স্ক মহিলা-টহিলা পাওয়া যেত। আমার রান্নার দায়িত্বটাও তাকে দিয়ে চালিয়ে দিতাম।

'কেনো চিন্তা করবেক লাই। হামার বেটিয়া সব কাম পারবেক। হামার ঘরওয়ালী বিমারে পরলে বেটিয়া সব সামাল দেয়।'

'কি নাম?'

'পেচি।' বীরুলাল উত্তর দেয়।

পেচি! এটা কোন নাম হলো?

'ছুটাকালে বেটিয়ার বহুত বিমার আছিল। কবিরাজ জ্বী বলছে, হামার জঙ্গলে বাচ্চাকাচ্চার সুন্দর নামে ডাক দিলে পেত্নীর নজর পরে।

'কিন্তু তোমার এত সুন্দর মেয়েটার নাম রেখেছ পেচি। এ নাম ধরে ডাকতে কেমন লাগে। '

'তুই একটা নাম দিয়া দিস বাবু, যে নাম তোয়াক ভালা লাগে।' বীরুলাল বলে।

মহিত বুঝতে পারল বীরুলাল তার মেয়েকে দিয়েই কাজ চালাতে চায়। সে অন্যকোন মানুষ জোগাড় করবে না। পকেট থেকে একশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিলো। বখশিস পেয়ে বীরু খুশিতে সালাম ঠুকে হন্হনিয়ে চলে যায়।

'বীরুলাল, ও কীভাবে বাড়ি যাবে?' মহিত জিজ্ঞাসা করে।

চিন্তা করবেক লাই বাবু। তোয়ার সব কাম শেষ করে একলাই যেতে পারবেক।' বীরু দ্রুত চলে যেতে যেতে বলে গেল। নগদ টাকা হাতে পেয়ে তার মদের নেশা চেপেছে।

মেয়েটিকে কাজ দেখিয়ে দেবার জন্য বলে, 'ভিতরে এসো। আগে ঘরটা ঝাড়ু দাও, ভীষণ ধুলো বালি জমেছে। কিন্তু তোমাকে কি নামে ডাকি বলতো।'

'তুই হামাক সুন্দর একটা নাম দিস বাবুজ্বী। হামার এ নামটা বহুত খারাপ আছে।' পেচি বলল।

'কি নাম দিই তোমাকে বলতো। চন্দ্রা, রুপালী, জ্যোৎস্না, স্নিগ্ধা-।' মহিত নাম খুঁজতে থাকে।

না, এ নাম সবই হামাক পাড়াত আছে।

'তাহলে কোন একটা ফুলের নাম চামেলী, বেলী, শিউলি, জুই, টগর?'

মেয়েটি মাথা দুলায়। পছন্দ হয় নাই।

করবী। এটা মনেহয় কারো নাই তোমার পাড়ায়। সুন্দর নাম করবী।

'না না, বাবুজ্বী এটা ভুলেও রাখা যাবে না।' মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে।

'কেন?' মহিত জিজ্ঞেস করে।

'কাবেরী নামে হামাক গ্রামে একটা মাইয়া আছে বহুত খারাপ। বহুত বদনাম আছে তার। সুন্দর কোন নাম লাই তোয়াক কাছে?'

মহিত সত্যিই চিন্তায় পরে যায়। আরো সুন্দর নাম চায় পেচি। পৃথিবীতে কত সহস্র নাম আছে শব্দ আছে কিন্তু এই মুহূর্তে কোন নামই মনে পড়ছে না মহিতের। পেয়েছি। গ্লোরি!

গ্লোরি? এটা কি ফুলের নাম।'

এটা ইংলিশ নাম।

'ইংলিশ নাম আছে এটা! হামাক ইংলিশ নামে তু ডাকবেক!'

'হু। পছন্দ হয়েছে?'

'হুম। বহুত সুন্দর আছে।' পেচির এবার নামটি পছন্দ হয়েছে। পরক্ষণে মুখটা কালো করে বলে,

'বাবুজ্বী, হামাক এ নামে তুই একা একা ডাকবেক। অন্য কারো সামনে ডাকবেক লাই। কেন, তোমাকে চুপি চুপি এ নাম ধরে ডাকতে হবে কেন?

হামাক জঙ্গলের লোক বহুত হারামী আছে। এটা শুনলে ওরাও মেয়ের নাম রাখি দিবেক গ্লোরি। এ নাম হামার বহুত পছন্দ আছে। হামি সাবধানে তুলে রাখবেক । এ নাম কাউকে দিবেক লাই হামি।'

মহিত মনে মনে হাসে। পেচি ঘর ঝাড়ু দিতে থাকে। ক্যাসেট প্লেয়ার অন করে দিয়ে সেভ করতে থাকে। এখানে অবসরে গানই তার সঙ্গী। গান বেজে উঠলে পেচি আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

'তোয়াক ঘরে গানা যন্ত্র আছে বাবুজ্বী! গানা হামার বহুত পছন্দ।' বলে খুশিতে কাজ করতে থাকে।

এরপর থেকে কাজে আসলেই পেচি আগে আবদার ধরে,' বাবুজ্বী গানা ছাড়।'

পেচি গান শোনে আর কাজ করে। সুন্দরমত সব কাজকাম গুছিয়ে শেষ করে ক্যাসেট প্লেয়ারের সামনে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে গান শোনে। মহিতের ঘরের ক্যাসেটের সব গান তার মুখস্থ হয়ে গেছে। গানের সাথে সাথে সেও এখন গলা

মেলায়। মহিত খেয়াল করে দেখে পেচির গানের গলাটাও সুন্দর। সুর আছে ওর কণ্ঠে।

কিছুদিন পর মহিতের এক র‍্যাংক সিনিয়র অফিসার হারুন সাহেব আসেন বদলি হয়ে জয়ন্তিকায়। মহিতের পাশেই তার বাসা। তিনি বাচ্চা দুটোর পড়ালেখার সুবিধার্থে স্ত্রী বাচ্চা সব ঢাকায় রেখে এসেছেন। সকালে দু'জন একসাথে হাঁটতে বের হন। অফিসিয়াল কথা ছাড়াও নানা ধরনের গল্প হয় দু'জনের। বয়সের পার্থক্য থাকলেও সম্পর্কটা এখন প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে গড়েছে। তিনিও বাসায় কাজের জন্য লোক খুঁজছেন। মহিত জানায় বীরুলালের মাধ্যমে তিনি বাসায় কাজের লোক পেয়েছেন। হারুন সাহেবও বীরুলালকে অনুরোধ করেন।

পরদিন পেচি এসে তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করে আর ক্যাসেট প্লেয়ারের কাছে বসে না থেকে চলে যাবার জন্য রেডি। কারণ জিজ্ঞেস করলে জানায় সে নতুন আর একটা কাজ নিয়েছে নতুন বাবুর বাসায়। তবে এখানে কাজের অসুবিধা হবে না। কারণ সকালে এখানে এসে ওখানে বিকেল বেলায় কাজ। সাহেবের রাতের রান্না শেষ করে বাড়ি যাবে। মহিত বুঝতে পারে পেচি হারুন সাহেবের বাসার কাজ নিয়েছে। বীরুলাল বেশ লোভী প্রকৃতির মানুষ। মেয়ের আয়ের পয়সায় সে মোজ করে মদ খাবে। মেয়ের চেয়ে মেয়ের টাকার প্রতি তার বেশি টান।

মহিত জিজ্ঞেস করে, 'দু'জায়গায় এত কাজ তুমি পারবে?'

'পারতে তো হবেক।'

'কষ্ট হবে না?'

'কি করবো বাবুজ্বী। হামারা গরীব আছি। নতুন বাবু তোয়াক চেয়ে মাহিনা বেশি দেবেক। দু'শো টাকা বাবাক বখশিস দিছে। বাবা বহুত খুশি আছে।'

'বেশতো ভাল।' মহিত গম্ভীর হয়ে বলে।'

'জানিস বাবুজ্বী, হামাক কেনো লাভ লাই।'

কেন?

'সব পয়সা বাবা মদ খাইয়া লিবেক।'

'তাহলে তোমার বাবাকে বলো তুমি আর কাজ করবে না।'

'ওরে বাব্বা, হামাক মারি মারি ঘরত বাহির করি দিবেক। হামাক বাবার দেমাক বহুত খারাপ আছে। তুই ওসব বুঝবি লাই।'

'তোমার মাকে বলো।'

'হামাক মাকে বাবা রোজ পিটায় মদের নেশা করি। মারি মারি এখন পঙ্গু করি দিছে। বিছান থাকি উঠতে পারে লাই এখন।' মেয়েটির কথায় তার মনের কষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পেচি আবার বলে, 'তবে তোয়াক বাসা মত সে বাবুর বাসা ভালা লাগে না মোর।'

কেন?

'ও সাহেবের কোন গানা যন্ত্র লাই। গানা হামাক খুব পসন্দ।' মহিত বুঝে পেচির গানের নেশা ধরেছে। গান যতক্ষণ বাজে সে সুন্দর করে কাজ করে। গান থেমে গেলে

বলে আরেকটা গান বাজাতে। সে মহিতের কাছে নিজের পছন্দের কথা অকপটে বলতে পারে। বেশ আবদারের সাথেই বলে। 'আকাশ মেঘে ঢাকা শাওন ধারা ঝরে' গানটি প্রতিদিন কয়েকবার সে শুনে।

মহিত বলে, 'গানটি কি তুমি মুখস্থ করছো গ্লোরি?'

সে শুধু খিলখিল করে হাসে। মহিতের খারাপ লাগে না তার সাথে সঙ্গীতময় সময়টুকু কাটাতে।

দু'দিন পর সকালে পেচি আসে মুখটা ভীষণ কালো করে। কেমন মন খারাপ ভাব। মহিত লক্ষ্য করে সে যেন নিজে নিজে কিছু একটা ভাবছে। কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। কাজে একেবারে মন নেই। সারাক্ষণ কি যেন ভাবছে। মহিত জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি হয়েছে?'

'কই কিছু না।' চমকে ওঠে পেচি।

মহিত কথা বাড়ায় না। একসময় সে মহিতের কাছে এসে বলে, 'হামার নতুন বাবু বাসাত কামে যাইতে মন চায় না।'

'কেন কি হয়েছে?' মহিত জিজ্ঞেস করে ।

বলে, 'লা কিছু লাই।' সে বুঝে কিছু একটা লুকোতে চাইছে।

বলো, 'তোমার কোন অসুবিধা হলে বলো আমি তাকে বলবো।' কোন উত্তর না দিয়ে পেচি চলে যায়।

পরদিন বেশ বেলা করে কাজে আসে পেচি । মুখ কালো করে কাজ করে যাচ্ছে । মহিত ক্যাসেট প্লেয়ার অফ রেখেছে । সে আজ গান ছাড়তে বলছে না। এমন কি নিজেও ছাড়ছে না । এতদিনে এ ঘরের প্রতিটা জিনিস যেমন সে আপন করে নিয়েছে তেমনি এক ধরনের অধিকার বোধও তার সৃষ্টি হয়েছে। এখন পেচি বাসায় এসে নিজেই ক্যাসেটপ্লেয়ার অন করে কাজে হাত লাগায়। এতে মহিতের সুস্পষ্ট সম্মতি আছে বৈকি। এই বিদেশ বিভুঁয়ে পেচিই পরম আত্মীয়ের মত স্থান করে নিয়েছে । মহিত জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার আজ যে গান ছাড়লে না।'

জানিস, 'ওই নতুন বাবু লোকটা বহুত খারাপ আছে।'

কেন?

'কাল ও আমার বুকে হাত দিছে।'

'আর কি করেছে সে?' কোন উত্তর দেয় না। চলে গেল।

মহিত এমনই কিছু একটা অনুমান করছিল। হারুন সাহেবের সাথে বিকেলে হাঁটতে বেরুলে দেখা হয় । অনেক গল্প হয় দুজনের। তবে মেয়েদের প্রসঙ্গেই গল্প বলেন বেশি। তিনি সেক্সচুয়াল গল্প বেশি পছন্দ করেন। মহিতকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে পেচির সাথে তার দৈহিক সম্পর্ক হচ্ছে কিনা । লজ্জা পেয়ে মহিত অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলেও তিনি ঘুরে ফিরে একই প্রসঙ্গে আসে।

হারুন সাহেব বলেন, 'জীবনটা হচ্ছে ভোগের জন্য। অযথা সময় নষ্ট করবেন না,মহিত সাহেব । ব্যাচেলর জীবনে সাধু সেধে বসে থেকে লাভ নেই।'

'বউ বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও আপনি? ভাবীকে এখানে নিয়ে আসুন।'

'আপনার ভাবী কাছে থাকলেও আমি বাড়তি কিছু পেলে সুযোগ ছাড়ি নাই। বুঝলেন।'

'মানে?'

আপনার ভাবী মেয়ে মানুষতো । সিনেমা দেখার নেশা আছে খুব । তাকে টিকিট কেটে সিনেমায় পাঠায় দিয়ে বাসার কাজের ছুড়িটার সাথে বহুত সময় কাটিয়েছি ।

'ভাবী কাছে থাকলেও!' অবাক হয় মহিত ।

আরে ভাই । শুনুন বউতো বান্ধা মাহিনা আর এসব হচ্ছে বোনাস । বোনাস ছাড়া কি জীবনে বাড়তি আনন্দ লাভ করা যায় বলুন ?'

'যদি ভাবীর কাছে ধরা পরে যান?'

ধরা। তা কি আর পরি নাই ভাবছেন? কিন্তু মেয়েমানুষ বলে কথা আছে না। তার উপর দু'দুটো বাচ্চার মা। যাবে কতদূর?

মহিত বুঝে নিয়েছে হারুন সাহেব বিকৃত রুচির মানুষ। এর সাথে শুধু এ ধরনের আলাপই চলতে থাকবে । তবুও সিনিয়র বলে বেশি কথা বাড়াতে চায় না ।

এ লোকটির কাছে পেচি কতটুকু নিরাপদ তা মহিত অনুমান করতে পারছে। সকালে বীরুলাল বাগান সাফ করতে আসলে পেচির সামনেই জিজ্ঞেস করে তাকে মহিত।

আচ্ছা বীরু, 'তোমার মেয়েকে এতগুলো বাসায় কাজ না করালে কি হয় না।'

'মানে?'

'পেচিকে হারুন সাহেবের বাসায় কাজে কেন লাগিয়েছ?'

'বাড়তি টাকার লাই বাবু'।

'তুমি কি জান হারুন সাহেব লোকটি কেমন?'

'বহুত ভালা লোক আছে। হামাক পরথম দিনে দু দুশো টাকা বাকশিস দিছে। এরপর হামাক বউয়ের শাড়ি কিনবার লাই আরো টাকা দিছে। দেখ হামাক এই জামা কিনে দিছে। বহুত ভালা আছে।'

মহিত বুঝতে পারে হারুন সাহেব তার অবৈধ আয়ের টাকা এসব খাতে ভালই ব্যয় করছে। বীরুলালকে খুশি করে তার অল্পবয়সী মেয়ের সর্বনাশ করছে ছিঃ ভাবতেই ঘৃণা করছে।

'সেই বাসা থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরতে যে পেচির রাত হয়ে যায় । এই জংলী পথে রাতের বেলায় একা কি নিরাপদ?'

'কোনো অসুবিধা নাই । হামাক জঙ্গলে ভয় নাই।'

ভয়ের কথা বলছি না । অল্প বয়সী মেয়ের কোন দুষ্টলোক যদি ইজ্জতের ক্ষতি করে।

'হামরা গরীবলোক আছি। এত ইজ্জতের মায়া হামাক মানায় না, স্যার। হামাক চাই টাকা।'

বীরুলাল কাজে চলে গেলে পেচি বলে, 'বাবুজ্বী, কাকে কি বলছিস,হামাক বাবা সবই জানে। সে এ কামে বহুত খুশি আছে। বেশি টাকা পাচ্ছে, বখশিসও মিলছে।'

পেচির জন্য দুঃখ হয়, নিজের বাবা সজ্ঞানে এসব কান্ডটি ঘটাচ্ছে মেয়েকে দিয়ে! কিন্তু তার করার কিছু নেই। এরপর থেকে সবই স্বাভাবিক। পেচি আর মনখারাপ করে না। মহিতও কিছু জানতে চায় না। আগের মত গান শোনাবার মত সময় পেচির নেই। কাজ করতে করতে যতটুকু শোনে।

কয়েকদিন পর মহিতের বদলীর অর্ডার আসে। ঢাকায় চলে আসার সময় পেচির খুব মনখারাপ ছিল। আবদার ধরেছিল, 'বাবুজ্বী, একটা কথা বলি,তু রাখবেক?'

হু, বল ।

'তুই হামাক তোর সঙ্গে তোয়াক বাড়িত লিয়ে যাবি?'

'কি করবি সেখানে?'

'এখানে তোর যে কাজ করি।'

ওখানে তোকে কাজ দেওয়ার মত কাজ নাই। ঢাকায় আমার নিজের ঘর নাই, সংসার নাই ।

'তু থাকবেক কোথা?'

ভাবছি মেসে থাকবো।

'সেখানে তোকে ভাত রান্না করবেক কোনে?'

'তাতে কোন অসুবিধা নাই। ঢাকায় অনেক ভালভাল খাবার হোটেল আছে, দোকানে প্রায় তৈরী খাবার কিনতে পাওয়া যায়। গ্যাসের চুলা আছে নিজেও অল্পসময়ে রেঁধে খাওয়া যায়।'

কোন যুক্তিতে তার মহিতের সাথে ঢাকায় আসা যাচ্ছে না। মহিত সব ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। পেচির মনটা সেদিন খুব খারাপ ছিল। হয়ত মহিতেরও। তবুও তাকে চলে আসতে হল নতুন কর্মস্থলে।

পেচি নতুন বাবুর বাসায় কাজে চলে গেল। মহিত চেয়ে দেখল। বোধহয় পেচির মনটা আরো বেশি খারাপ ছিল আর গান শুনতে পারবে না ভেবে। এরপর আর কোনদিন মহিতের জয়ন্তিকায় যাওয়া হয়নি। আর পেচির কোন খবর রাখেনি।

এখন রিটায়ার্ড জীবন। কিছুদিন আগে এক মার্কেটে ঔষধের দোকানে দেখা হয়েছিল হারুন সাহেবের সাথে। তাকে প্রথমে চিনতেই পারেনি মহিত সরকার। ভীষণ বিমর্ষ চেহারা। কেমন থুরথুরে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। চুলগুলো উসকো খুসকো। হারুন সাহেব তাকে চিনতে পেরে পিছন থেকে ডাক দিলেন। বহুবছর পর দেখা কিন্তু কুশল বিনিময়ের সময় ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত। দুজন দুজনের ফোন নম্বর বিনিময় করলেন। ইচ্ছে থাকলেও কথা বলার সময় ছিলো না কারোই।

আজ ফেসবুকে এই গ্লোরি নামটি দেখে হারুন সাহেবের কথা প্রথমেই মনে পড়ল। সে চলে আসার পর হারুন সাহেব বেশ কিছুদিন ছিলেন জয়ন্তিকায়। পেচির সর্বশেষ সংবাদ সে জানতে পারবে ভেবে মহিত হারুন সাহেবকে ফোন করে তার বাসার ঠিকানা নিয়ে চলে যান এক সকালে।

কল্যাণপুরে তার বাসা। কলিংবেল টিপলে হারুন সাহেক নিজেই দরজা খোলেন । ঘরে ঢুকেই হোঁচট খেল মহিত। ঘরের ভিতরটা খুবই কম আলো স্যাঁতসেঁতে। ভ্যাপসা দুর্গন্ধময়। প্রচণ্ড রকম অগোছালো পুরো ঘরবাড়ি। কেমন অস্বাভাবিক। বসতে বললেন হারুন সাহেব কিন্তু সত্যি বলতে কি এমন অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন ঘরে বসতে শুধু মহিত কেন, যে কারোরই রুচিতে বাধবে ।

জিজ্ঞেস করলেন মহিত, 'ভাবি কোথায় দেখছি না যে?'

'পাশের ঘরে। চলেন দেখিয়ে আনি।'

হারুন সাহেব তাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন । হঠাৎ বিকট চিৎকার! তার বদ্ধ উন্মাদ স্ত্রী চিৎকার করছে, যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছে তাই ছুঁড়ে মারছে উনাদের দিকে। তারা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যান। তার স্ত্রীকে খাটের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। 'এই হল আমার অবস্থা।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন হারুন সাহেব।

'চিকিৎসা করাচ্ছেন না?' মহিত জিজ্ঞাসা করে।

'বহু করিয়েছি। পাগলা গারদেও ছিল বেশ কয়েকবার। কোন লাভ হয়নি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

হারুন সাহেবের গলায় আঁচড়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন । কাটা হাতের কোণে ব্যান্ডেজ লাগানো। দেখে মহিত জিজ্ঞেস করল, 'ভাবী তো আগে এমন ছিলেন না। শুনেছি আপনারা দুজন দুজনকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। তিনি আপনাকে খুবই ভালবাসতেন। এমন হলেন কীভাবে?'

'আর ভালবাসা! আমার উপর তার যত আক্রোশ, এখন তীব্র ঘৃণা। ডাক্তার বলেছে তার দীর্ঘদিনের জমানো সন্দেহ, হতাশা আর অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে । তার ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটায় এমন অবস্থা।' মহিত চুপ করে রইল।

'এর থেকে উত্তরণের আর উপায় নাই বুঝলেন মহিত সাহেব। আমৃত্যু আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হবে।'

হারুন সাহেবের এমন দুরবস্থা! এ যে মহিত স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। পরিবেশ হালকা করার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করেন মহিত। তাছাড়া মহিতের মনের মধ্যে পেচির সংবাদ জানার জন্য আঁকুবাঁকু করছে। এক সময় সে জানতে চাইল জয়ন্তিকার পেচির কোন সংবাদ জানেন কিনা। হারুন সাহেব জানালেন, সেতো বহুবছর আগের কথা । তার কোন খবর জানে না।

হারুন সাহেব বললেন, 'আসলে মহিত সাহেব, আমার মনেহয় পেচির অভিশাপও আমার উপর লেগেছে । পেচির বয়সী আমার একটি মেয়ে ছিল। সেও একদিন পাড়ার একটা বখাটে ছেলের সাথে ভেগে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে তার ঠিকানা জানি না। বহু খুঁজেছি। হদিস মেলেনি। আর আমার একমাত্র ছেলেটিও নেশাখোর। দেখুন, আজ কয়েকদিন হলো ঘরে ফিরেনি। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে জানিনা। আবার সে বাড়ি আসলেও সে এক মহাযন্ত্রণা! নেশার টাকার জন্য কি যে করে আমার সাথে। দেখুন আমি নিজেও ডায়াবেটিসের রোগী। প্রতিদিন ইনসুলিন নিতে হয়।'

মহিত খুবই মর্মাহত। ভাবছে হারুন সাহেবের শেষ জীবনটা কেন এমন হলো? বহুদিন পর মহিতকে পেয়ে মনের কষ্টের কথাগুলো বলে যাচ্ছেন গড়গড়িয়ে।

বললেন, 'জানেন আমি বিশ্বাস করি মানুষের বেহেস্ত-দোজখের জন্য পরকালের অপেক্ষা করতে হয় না। এই পৃথিবীতেই সব আছে। পরকালে কি হবে জানি না। তবে প্রতিটি মানুষের নিজের কর্মফল এজীবনেই ভোগ করে যেতে হয়। যেটা আমার হচ্ছে। সারাজীবন ধরে আমার অর্জিত পাপের শাস্তি এখন পুরোটাই ভোগ করছি। এটাই তো আমার আসল দোজখ বাস।'

তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা মহিতের নেই, শুধু মন খারাপ করে বাসায় ফিরে আসা ছাড়া।

মহিতের আজ গ্লোরির কথা জানতেই হবে। সেও গ্লোরির প্রতি অবিচার করেছে। তার নিশ্চিত অন্ধকার জীবন দেখেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি সেদিন মহিত। লোলুপ বাঘের খাঁচায় ফেলে রেখে সে কাপুরুষের মত চলে এসেছিল। তার জন্য নিতে পারেনি কোন সাহসী ভূমিকা। আজ একাকী অবসরে তাকেই মনে পড়ে অপরাধবোধ হচ্ছে। একদিন পেচি তার সাথে চলে আসতে চেয়েছিল। তাকে ফেলে এসেছিল স্বার্থপরের মত। সারাজীবন নিজের সব দায়িত্বকর্তব্য সুন্দরভাবে পালন করলেও জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে সে এখন কত একা!

চাকরি জীবনে মহাব্যস্ততায় কেটে গেছে তার সময়। অতীতের ফেলে আসা স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগ কই। আস্তে আস্তে কখন যে এত একা হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। স্ত্রী মারা গেছে, একমাত্র পুত্র বৌ-বাচ্চা নিয়ে প্রবাসে। এখন তার অখন্ড অবসর, ভয়াবহ একাকীত্ব। নিরব নির্জন গৃহে একা দমবন্ধ হয়ে আসে । সে পেচির খবর নিতে রওনা দিল জয়ন্তিকায়। বহুবছর পর সেই পুরোনো স্থানে গিয়ে পৌঁছল মহিত। তার চেনা সেই জয়ন্তিকা এখন আর নেই। তার সেই তখনকার বাসগৃহ সুউচ্চ কোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে। বহুকাল আগে ফেলে রেখে যাওয়া পেচিকে সে খুঁজছে। বীরুলালকে খুঁজছে। পেচিকে পেলে হয়ত ঠিকই সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু কোথাও তাদের হদিস নেই। মহিত ক্লান্তিহীন খুঁজে চলেছে। খুঁজে খুঁজে অবশেষে জানতে পেল। বীরুলাল নেশা করতে করতে বহু আগে মারা গিয়েছে। পেচির আর কোন বিয়ে সাদী হয়নি। নষ্ট মেয়ে হয়ে গিয়েছিল। শহরতলীতে থাকত বাসা ভাড়া করে। শেষের দিকে তার খদ্দের তেমন মিলতো না আগের মত। না খেয়ে থাকতে হত প্রায়ই। সমাজে তার কোন স্থান ছিল না। পাড়ার সবাই ঘৃণাচোখে তাকে দেখেছে। কয়েকমাস আগে জঙ্গলে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। পেচি বেঁচে নেই।

ঢাকায় ফিরে মহিত হিসাব করে দেখেছে ঠিক যেদিন গ্লোরি নামক মেয়েটি ফেসবুক খুলেছে সেদিনই ছিল পেচির আত্মহত্যার দিন। এত মিল ! তা কি করে হয়? সে ফেসবুকে গ্লোরির একাউন্টে ঢুকে। এইমেয়েটি সেই পেচি নাইবা হলো। কিন্তু একই নাম, সেও গান ভালবাসে, গান শুনতে চাইছে। এবার মহিত অন্তত এই মেয়েটির ইচ্ছাপূরণ করবে। সে অনেক গান পোস্ট করলো তার একাউন্টে। সেসব গানের তালিকার মধ্যে ছিল 'আকাশ মেঘে ঢাকা শাওন ধারা ঝরে, যেদিন পাশে ছিলে সেদিন মনে পড়ে।'

কাপালী

মনে হয় সে এক আদিম জঙ্গল। বড় বড় গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গহীন সে জঙ্গল। তার ভিতর লতাপাতা, গুল্ম, বেতঝাড়, বাঁশঝাড়, বুনোকচু ইত্যাদি সম্বলিত। মনুষ্যপদচিহ্ন বিবর্জিত দুর্গম এক বনভূমি। অদ্ভুত নির্জনতা। শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দে দিনের বেলায়ও গা ছম ছম করে ওঠে। সাধারণ মানুষজন কখনো এখানে প্রবেশ করে না। নানা ধরনের কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে এ বনকে ঘিরে। এটা পোড়াবাড়ির জঙ্গল বলে পরিচিত। গভীর জঙ্গলে রয়েছে নাকি একটি পোড়ো বাড়ি। কেউ বলে ইংরেজ আমলে নীলচাষের জন্য ব্যবহৃত অত্যাচারী নীলকরের কুঠিবাড়ি। কেউ বলে কোনও ব্রাহ্মণের পরিত্যাক্ত ভিটা। সেটিও কালের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা লতাপাতায় এমন বেষ্টিত যে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এখানে রয়েছে একটা ভগ্নবাড়ির দেয়াল। তবে এ জঙ্গল কাপালীর নিভৃতচারণ ভূমি।

পুরো নাম অনিল কাপালিক। ছোটবেলা থেকেই বাড়ির পাশের এই জঙ্গলের প্রতি তার ভীষণ আসক্তি। এখানে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। তখন থেকেই অনিল মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢুকলে তিনচারদিন পর বের হতো। এ সময় কি করে কি খায় তা কেউ জানে না। জঙ্গল থেকে বের হয়ে বাড়ি আসে। মা-বৌদি কিছু খেতে দিলে খায়, নয়তো না খেয়েই থাকে। কারো প্রতি কোনো আক্ষেপ নেই। কারো সাথে তেমন কোন কথাও বলে না। সুঠাম দীর্ঘ কালো দেহ রক্তিমবর্ণ চক্ষু। উসকো-খুসকো কোঁকড়ানো চুল। কিছুটা গোঁয়ার প্রকৃতির মনে হয়। কি শীতে কি গ্রীষ্মে একই বস্ত্র। উদোমদেহে স্বল্প কাপড়ের একটি নেংটির মতো পরে অর্ধ উলঙ্গ থাকে সব সময়। অসুরের মতো শক্তি। নদীতে কাঠের গুড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে তুলতে যেখানে তিন চারজন লোকের ঘাম বের হয়ে যায়, সেখানে একদিন এ সময়ে কাপালী এসে সবাইকে

তাক লাগিয়ে দেয়। একাই দড়ি ধরে পুরো কাঠের গুঁড়িটা টেনে উপরে তুলে। সবাই হা হয়ে যায়। কেউ বলে ওর উপর দেও-দানবের ভর আছে। কেউ কেউ বলে ও মানুষ নয়। তাইতো মনুষ্যসমাজে সে থাকতে পছন্দ করে না। কাপালী হাঁটতে হাঁটতে ওর চিরচেনা পথ ধরে আবার বনে ঢুকে যায়।

সে ঋষি বাড়ির ছেলে। হতদরিদ্র গোষ্ঠিটি আদি পুরুষের পেশা ধরে আছে। ব্যাগ জুতা সেলাইয়ের পাশাপাশি বাড়িতে পুত্র, বৌ, ঝি, সবাই মিলে বাঁশ ও বেত দিয়ে কুলা, ঝুড়ি, ঝাঁপি ইত্যাদি তৈরি করে। গ্রামের হাটে হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর এ সময় কাপালীর দিন কাটে জঙ্গলে একা ঘুরে ঘুরে। তার সঙ্গী কেবল কাঁধের তীরধনুক। জঙ্গলের গাছে গাছে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। হাতের নিশানা খুব তীক্ষ্ণ। পাতা কুড়ানি কাঞ্চি বনের ধারে প্রায়ই যায় জ্বালানির সংগ্রহে। একদিন সে দেখেছিল কেমন নিরিখ করে তীর ছুঁড়ে অনিল গাছ থেকে ফল পেড়ে খায়। ওর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রয় কাঞ্চি। কাঞ্চিকে দেখে কাপালী গাছ থেকে আরো কিছু ফল পেড়ে নিয়ে এগিয়ে আসে। কাঞ্চি ফলগুলো কাঁচুলিতে পুরে রাখে। বাড়ি নিয়ে পরমানন্দে খায়। এরপর থেকে কাঞ্চি ঘন ঘন বনের ধারে যায়। যদি তার দেখা পায়, যদি উপহার স্বরূপ কিছু বনফল সে পায়। কিন্তু সেভাবে দেখা তার মিলে না। তবে প্রতিদিন পাতা ঝাড় দিয়ে স্তুপ করে যখন কাঞ্চি ঝুড়ি আনতে যায়, এসে কিছু না কিছু পাকা ফল পায় কুড়ানো পাতার উপর।

ঋষিবাড়ির আশেপাশের হিন্দুরা যুদ্ধের কারণে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। কারণ পাকবাহিনী যুদ্ধের শুরুতেই দখল করে নেয় গোপালগঞ্জের এই ভাটিয়াপাড়া অঞ্চলটি। ভাটিয়াপাড়া নৌ ও রেলপথের সংযোগস্থল। এ অঞ্চলের একমাত্র ওয়্যারলেস টাওয়ারটি রয়েছে এখানে। আর পাকবাহিনী শক্ত ও বৃহৎ ক্যাম্পটি করে এখানেই। পূর্ব পাকিস্তানের যত গণ্ডগোল তার নেতৃত্বে রয়েছে এ অঞ্চলের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান। এখানকার ধুলিকণা লতাপাতা সবই নাকি মুজিবঅন্ত প্রাণ। তাই এখানে বিশেষ নজর, স্পেশাল অপারেশন চালানোর নির্দেশ রয়েছে উপর মহল থেকে। অতএব 'জ্বালাও পোড়াও গুলি চালাও' নীতির সাথে রয়েছে আরো অন্যান্য অত্যাচার। তাছাড়া আর্মির সহযোগী দালালেরা বিশেষ করে হিন্দু বাড়ি পেলেই লুটতরাজ করে। কিন্তু গরিব কাপালিকের বাড়িতে কিইবা আছে যে লুটপাট হবে। তাই ওরা দেশ ছেড়ে যায়নি। যুদ্ধকালীন অঞ্চলটি পাকআর্মির পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। এখান থেকেই গোলা বারুদ-অস্ত্র নিয়ে পার্শ্ববর্তী ফুকুরা, মাঠলা, দিঘলিয়া, গোপীনাথপুর, দূর্গাপুর, ডিক্রিরচর, ইটনা, বরফা ইত্যাদি গ্রামে আর্মি অপারেশন চালায়। শক্তিশালী পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আঘাত হানার জন্য গোপনে মুক্তিবাহিনী জড়ো হচ্ছে। এ খবর মিলিটারি ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। লংমার্চ করে কিছু সেনা গ্রামের পথে এগোয়। মাঝপথেই বেধে যায় যত গণ্ডগোল। চারদিক থেকে মুক্তিবাহিনীর গুলির মুখে আর এগোতে পারে না।

হতাহত হয় প্রচুর। ওরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাতে শুরু করে। দুজন সেনা দ্রুত জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাকিরা কোনওমতে ক্যাম্পে পৌঁছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মুক্তি ছেলেরা চলে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে। পরবর্তী অপারেশনের জন্য আরো অস্ত্র ও গুলির সংগ্রহে।

অনিল কাপালী সে রাতটি তার অভ্যাসবশত বনেই কাটিয়েছে কোনো এক গাছের ডালে। আকাশ একটু ফর্সা হতেই পাখির কিচিরমিচিরে ঘুম ভাঙ্গে। এ জঙ্গলের প্রতিটি পশুপাখি তার চেনা। তাদের চলাচলের শব্দও তার পরিচিত কেমন যেন অচেনা শুকনো পাতার শব্দ শুনতে পায় কাপালী। বড় বড় মানকচু পাতার নিচে পলাতক সেনা দুটি সুসজ্জিত অস্ত্রসহ ঘাপটি মেরে ছিল। মুহূর্তেই কাপালী উপর থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর। দুহাতে দুজনের গলা পেঁচিয়ে ধরে। ধস্তাধস্তি হয় অনেকক্ষণ। কাপালীর শক্তির কাছে পাঞ্জাবী দুজনসেনা একেবারে কাৎ। কোনো রকমে অন্তত একজন ছাড়া পেলে গুলি করে কাপালীর খুলি উড়িয়ে দিবে। অনিলকাপালী তার সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরেছে। কিছুতেই ওরা নিজেকে আলগা করতে পারছে না। আস্তে আস্তে একজন সেনা অবশ হয়ে ওর হাতেই ঢলে পড়ে। তবুও ছাড়েনি তাকে। অন্যজন কোনো মতে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। অস্ত্র তাক করে। অস্ত্র কি জিনিস কাপালী তা বুঝে না। ঠিক গুলি করবার মুহূর্তেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলি এসে লাগে কাপালীর পায়ে। আবারো ধস্তাধস্তি। নিরস্ত্র আহত কাপালী এবার সেনাটির চোখে আঙুল ঢুকিয়ে তুলে নেয় তার বাম চোখ। বিক্ষিপ্ত গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালাতে শুরু করে । কাপালীর পা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে আর এগোতে পারে না। সেনাটি কোনো মতে জীবন নিয়ে গ্রামের সবার অলক্ষ্যেই আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছে। কাপালী বুনো লতাপাতা বেঁধে নেয় নিজপায়ে। সে রাতে জঙ্গলেই বিশ্রাম নেয়।

এদিকে সংবাদ শোনা মাত্র ক্যাম্পে হিংস্র সিংহের মতো গর্জে ওঠে পাক আর্মি। এ রকম ঘটনা তাদের নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্প এলাকায় ঘটতে পারে ওরা ভাবতেও পারেনি। বর্ণনা শুনে দালালেরা অনুমান করে এ অনিল কাপালীর কাজ। দুপুরের মধ্যেই বিপুল অস্ত্র ও বাহিনী নিয়ে পাকসেনাবাহিনী গ্রামটি ঘিরে নেয়। বৃষ্টির মতো গুলি নির্বিচারে চালাতে চালাতে গ্রামে ঢুকে। বাড়ি বাড়ি আগুন ধরিয়ে দেয়। পাখির মতো গুলি করে অসহায় মানুষগুলোকে। দালালের সাহায্যে খুঁজে বের করে অনিল কাপালিকের বাড়ি। ওর বৃদ্ধ বাবা-মা ও পক্ষাঘাতে অথর্ব ঠাকুরদাদাকে গুলি করে। বৌদিকে তুলে নিয়ে যায়। জীর্ণ দুটি কুঠিঘরেও আগুন ধরিয়ে ক্ষান্ত নয়। তারা এবার চায় কাপালীকে। তছনছ করে দেয় গ্রাম। যাবার সময় কয়েকজন গ্রামবাসীকে বলে যায় অনিল কাপালীকে অবিলম্বে ধরে ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে। নইলে গ্রামের অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে। সময় দু'দিন বেঁধে দিয়েছে।

গ্রামের লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাতে লাভ হয় না। কারণ পুরো গ্রাম আর্মি ঘিরে রেখেছে, দু'দিন ধরে। দুদিন পর আর্মি এসে আবারো তাণ্ডব শুরু করে। অস্ত্রের মুখে গ্রামের সব লোকজনকে লাইন ধরিয়ে মধুমতির তীরে নিয়ে দাঁড় করায়। ছোট বড় শিশু বৃদ্ধ কাউকে বাদ দেয়নি। এমনকি পাক আর্মিদের দোসর দালালদের পরিবারও রয়েছে সে দলে। গ্রামে কোনো বাড়িতে আর কোনো মানুষ নেই। কাপালীকে পেলেই এদের ছেড়ে দেবে নইলে গুলি চালাবে। মধ্যদুপুর পার হয়ে গেল। কাপালীকে কোথাও পাওয়া যায় না। তন্নতন্ন করে গ্রামময় খুঁজে বেড়াচ্ছে দালালেরা ডাকাডাকি করে, 'কাপালী কোথায় আছিস?' বাবা মার মৃত্যু ও তার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলার পর কেউ তাকে আর দেখেনি। তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। এ গহীন জঙ্গল থেকে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বেঁধে রাখা

গ্রামবাসীদের এবার নদীপারে জেগে ওঠা চরে নিয়ে যায়। সকলেই বুঝতে পারে মৃত্যু নিশ্চিত। একই সাথে পুরো গ্রাম জনশূন্য হবে। এখনই গুলি চালাবে।

কাঞ্চি জঙ্গলে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। নদীপারে লাইনে দাঁড়ানো গ্রামবাসীদের সাথে রয়েছে তার মা-বাবাও। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর খচ্‌খচিয়ে ওঠে। কাঞ্চি পিছনে তাকিয়ে দেখে কাপালী কিছুটা দুর্বল শরীরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। গুলিতে প্রচুর রক্ত ঝরেছে তবুও খোঁড়াতে খোঁড়াতে বন থেকে বের হচ্ছে। কাঞ্চি দৌড়ে এসে পথ আগলে ধরে পালাও! ওদিকে যেও না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কাঞ্চির কোনো নিষেধ শুনতে পেল কিনা, বোঝার আগেই নদী পারে আর্মিরা সবাইকে ঘুরে দাঁড়াতে বলে। 'পায়ে পড়ি তোমার, তুমি যেও না।' কাপালীর চক্ষু দুটি পলাশের মতো ফুটে ওঠে। কাঞ্চির হাতটি সযত্নে সরিয়ে সে বন থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। নদীর দিকেই সে এগিয়ে যাচ্ছে। দালালেরা চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'এই তো পেয়েছি।' সাথে সাথেই আর্মিরা ঘিরে ধরে ওকে। গ্রামবাসী মুক্তি পেল। গ্রামবাসীর সমুখেই চলে কাপালীর প্রতি বীভৎস অত্যাচার। প্রথমে মধুমতি নদী তীরে তাকে পা বেঁধে একটি গাছে লটকায়। তারপর বেওনেট দিয়ে দু'চোখ খুঁচে খুঁচে তুলে নেয়। এরপর শরীরের চামড়া ছিলতে থাকে জবাই করা গরুর মতো। তাতেও প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হয় না। তাই এরপর ইচ্ছামতো গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয় অনিল কাপালিকের দেহ। যাবার সময় শাসিয়ে যায় কেউ যেন এ লাশ গাছ থেকে না নামায়। ভয়ে থমথম চারিদিক।

দুদিন পর পচা দুর্গন্ধ ছুটতে থাকে। গ্রামে থাকা যায় না। তখন গ্রামের কিছুলোক গাছ থেকে নামিয়ে অর্ধগলিত মৃতদেহটি মাটি চাপা দেয় জঙ্গলে। ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতারা যেন গাছ থেকে ঝরে পড়ে সে স্থানটি ঢেকে দেয়। কিছুদিন পর আবার কাঞ্চি পাতা কুড়াতে যায় সে জঙ্গলে। কানে ভাসে কে যেন খচ্‌খচ্‌ শব্দে হেঁটে হেঁটে বনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্তরে বাহিরে

ঘন সবুজে ঢাকা ছোট্ট গ্রামটির নাম ফলসী। তার পাশ দিয়ে মধুমতি কুল কুল করে ছুটে চলেছে। এই ছুটে চলার ছন্দে ফুলির মনও যেন নেচে উঠে। নদীর পারে পাট ক্ষেত একটু বাতাসের ছোঁয়ায় নুয়ে পড়ে। তারপাশে ধানক্ষেত, সেখানেও ঢেউয়ের খেলা। বাতাসের দোলায় দু'বেনী দুলিয়ে ক্ষেতের সরু আল দিয়ে ফুলি নেচে নেচে যায়। আর হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আলের দু'ধারের সবুজ ধানক্ষেত। বড় সুখকর সে অনুভূতি। চপলা ফুলির ভালো লাগে নদীর পানিতে পা ভেজাতে। ভালো লাগে পাল তোলা নৌকার দিকে একমনে চেয়ে থাকতে। পানসীগুলো যখন গুণ ধরে সামনে দিয়ে যায় তাও ভালো লাগে দেখতে। ইচ্ছে হয় তারও একটু গুণ ধরে টানতে। কদমের উঁচু ডালে যখন কোকিল কুহুকুহু করে ডাকে, তাকেও এক নজর দেখতে ভুল করে না। ফুলের মতো দেখতে বলেই ছোট বেলায় বাবা তার নাম ফুলি রেখেছিলেন। সত্যিই যেন তাই। হাসিতে গোলাপী ঠোঁটের পাশ দিয়ে মুক্তোর ঝিলিক। আর কারণে অকারণে হাসতেও পারে মেয়েটা। মাঝে মাঝে মায়ের বকাও খায় এই হাসির জন্য।

'এখন বয়স হয়েছে, ধীর স্থির হ। কদিন বাদে পরের ঘরে যাবি।'

'ইস্, তুমি বললেই আমি যাবো নাকি?'

ফুলি দৌড়ে চলে যায় তার কাজে। গাছের বরই পাড়তে। ফুলি গাছ ঝাঁকিয়ে তেমন একটা সুবিধা করতে পারলো না। অবশেষে ওড়না পেঁচিয়ে গাছে উঠে।

শফিক কলেজ শেষে বাড়ি ফিরছিল। ফুলিকে দেখে সাইকেল থেকে নেমে আসে। বললো---

'তুই নাম-আমি পেড়ে দিচ্ছি। এভাবে যখন তখন গাছে চড়তে নেই। পড়লে হাত-পা ভাঙ্গবে।' প্রতিবাদ না করে ফুলি নীরবে নেমে আসে।

শফিকের বড় ভালো লাগে পাশের বাড়ির এই মেয়েকে। যাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। চঞ্চলা- সরলা বড়ই মিষ্টি মেয়েটি। মুখ ফুটে কখনো বলেনি। সময়তো যায়নি, পরে বলবে। শফিকের বাবা-মার ইচ্ছাও যেন তাই। মা পাট শাক ডাল দিয়ে রান্না করে বাটি ভরে ফুলিকে দিয়ে পাঠায় ও বাড়িতে। রাঙ্গাচাচী শফিকের মা নাড়ু মুড়ি ফুলিকে খাওয়ায়। আগোছালো ফুলির চুল বেনী করে দেয়।

অন্য ঘর থেকে শফিক ভাবী ছেলের বৌয়ের প্রতি মায়ের আদর দেখে। বড় লক্ষ্মী এই মা। ছেলের মনের কথা বুঝতে পারে সহজে।

রাঙা চাচী ফুলির মার জন্য বাটিতে আচার তুলে দেয়। ফুলি তা নিয়ে বাড়ি মুখে রওনা হয়।

'শফিক গোসল সেরে আসুক। ফুলি ভাত খেয়ে যাস'--- শফিকের মা বলে। 'না চাচী আরেকদিন খাবো'----বলেই দৌড়।

আজ ফুলি, কমলা, হাসিনা ও মায়াসহ অন্য বান্ধবীরা মহাব্যস্ত। আম বাগানে বনভোজন। মায়ের শাড়ি পরেছে সবাই। হাঁটতে গিয়ে এক একজন হোঁচট খাচ্ছে। তা দেখে অন্য সখীরা হেসেই লুটোপুটি। চাল, তেল, মশলা ও অন্যান্য জিনিস এক এক জনের বাড়ি থেকে এনেছে। গাছের নিচে মাটি খুঁড়ে ইট বসিয়ে চুলা বানিয়েছে। জ্বালানীর অভাবতো নেই। কমলা ও হাসিনা ঝাড়ু দিয়ে বাগানের শুকনো পাতা জড়ো করেছে। প্রচুর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো রান্না। খিচুড়ি আর ডিম ভুনা।

রাস্তা দিয়ে যাবার পথে ধোঁয়া দেখে বাগানের দিকে এগিয়ে এল শফিক ও মুরাদ ব্যাপার কি জানার জন্য।

কমলা, 'রাহেলা অনুরোধ করে-- তোমরা এসেছো যখন তখন খেয়েই দেখো না।'

কলাপাতায় খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফুলি শফিককে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন হয়েছে?'

শফিক কিছুটা নিচু স্বরে কানের কাছে এসে বলে, 'ভালোই তো রাধঁতে শিখেছিস। এবার মাকে বলবো শীঘ্রই ঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে। ফুলি লজ্জায় লাল হয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে অন্যরা শুনে ফেললো কি না।'

সাধারণত প্রেম যেমন হয়, এ যেন তা নয়। ভালো লাগা আছে, স্বপ্ন আছে, আশা আছে, আছে অগাধ বিশ্বাস। ফুলির মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে- লাল শাড়ি আর গহনা পরে শফিকের বাড়ি যাচ্ছে। আর পাশে শফিক পাজামা-পাঞ্জাবী পরা। কেমন যেন শিহরণ বোধ করে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সুরুজ আম বাগানে শফিক ও মুরাদের দেখা পেল। কি যেন বিশেষ প্রয়োজন তার। তিন বন্ধু ফিসফিস্ করে কোনো এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। যাহোক অতকিছু বোঝার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না ফুলিরা। বনভোজনের পর্ব শেষ করে সব গোছানোর কাজে তারা ব্যস্ত।

রাতে উঠোনে মাদুর বিছিয়ে ফুলির বাবা, চাচা ও গ্রামের অন্য মুরুব্বিরা রেডিওর সংবাদ শুনছেন মনোযোগ দিয়ে। সবাই কেমন যেন শঙ্কিত। সংবাদ শুনে মন ভরছে

না তাই বারবার স্টেশন ঘুরিয়ে আকাশবাণী, বিবিসি অথবা ভয়েজ অব আমেরিকা শুনছে। আজ ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু কি যেন বলে গেলেন। তা নিয়ে সবার মুখে মুখে আলাপ, গুঞ্জন। ফুলির মাথায় কিছুই ঢোকে না। বারান্দায় বসে মা, চাচী, দাদী ও অন্যান্য সব মহিলা পান চিবোচ্ছেন আর উঠোনের পুরুষদের কথোপকথন শুনছেন। যেসব মহিলারা সারাদিন ধান ভেনে, গোয়ালঘর পরিষ্কার করে, রান্না করে আর সন্ধ্যায় আহার সেরে ঘুমিয়ে পড়তো, তাদেরও চোখে আজ রাতে ঘুম আসছে না। কি এক গভীর উৎকণ্ঠা সবার মধ্যে। চারদিকে ভীষণ অস্থিরতা বিরাজ করছে, ফুলি শুধু এটুকুই বুঝতে পারে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ফুলি।

গ্রামের সবার প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন। কৃষকের জমিচাষে মন বসে না। মাঝির কণ্ঠে গান ধরে না। কর্মকারের হাত উঠে না কর্মে। দেশের অবস্থা নিয়ে সবাই চিন্তিত। এখন কি হবে? দেখি না কি হয়? এমনই কথাবার্তা সর্বত্র। শহর- গঞ্জ থেকে সবাই এখন গ্রামমুখি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা, বিভিন্ন ঘটনা মুখে মুখে। ২৬শে মার্চের লোমহর্ষক বর্ণনা শুনে গ্রামের লোকেরা বিমর্ষ, উৎকণ্ঠিত আর বসে থাকা নয়। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহবানে জেগে উঠেছে দেশ। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। যুদ্ধ শহরতলীতে শুধু নয়। শহর ছাপিয়ে গ্রামে গ্রামে হানাদাররা হানা দিচ্ছে। নিরাপদ বলে কোনও স্থান আর নেই দেশে। নিরীহ বাঙালি ভারত যাচ্ছে দলে দলে। শুধু আশ্রয় নিতে নয়, যুদ্ধের ট্রেনিংও নিচ্ছে। যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। দেশরক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করেই ছাড়বে।

রাতে কয়েকজন যুবক উঠানে এসে ডাক দেয়–-'চাচাজান বাড়ি আছেন?' শফিকের কণ্ঠস্বর শুনে ফুলির বাবা দ্রুত দরজা খুলে বাইরে আসে। পিছনে পিছনে ফুলির মা। ফুলি পড়ার টেবিল থেকে উঠে হারিকেন হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়।

ওরা ফুলির বাবার সাথে কথা বলে পা ছুঁয়ে সালাম করে। এগিয়ে এসে ফুলির মাকেও সালাম করে বলে 'চাচী দোয়া করবেন। আমাদের জয় হবেই ইনশাল্লাহ।' ফুলি আঁৎকে ওঠে। ওরা যুদ্ধে যাচ্ছে- বুঝতে বাকি থাকে না। কি যেন বলতে চাইছিল। আড়ষ্ট ঠোঁটের সেই অস্ফুট স্বর কেউ শুনলো না। শফিক ফুলির দিকে তাকিয়ে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে রওনা দেয়। অনেক জমানো কথার ইশারা মাত্র যেন সময়ের অপেক্ষায় রইলো। তাদের চলে যাওয়ার পথপানে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফুলি ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

বাড়ির সবাই চিন্তিত। গ্রামের সবাই চিন্তিত। দেশের সবাই চিন্তিত। যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ। চারদিকে লাশ আর লাশ। মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম রাখাই বড় দায়। এমতাবস্থায় ফুলির বয়সী মেয়ে আর ঘরে রাখা ঠিক নয়। তড়িঘড়ি করে বিয়ে ঠিক করে ফেলে ওর বাবা। পাত্র হাইস্কুলের মাস্টার। গত বছর প্রথম সন্তান প্রসবের সময় বৌ মারা গিয়েছে। বাড়ির অবস্থা ভালো। বংশ খারাপ নয় । এই ঘন দুর্যোগের সময় পাত্র জুটেছে, এই বড় ভাগ্য। অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে শুধু কয়েকজন মুরুব্বী ও মৌলভীসাহেব দিয়ে ফুলির বিয়ে সম্পন্ন হয়।

ফুলি এখন শ্বশুর বাড়ি যাবে। লালশাড়ি পরানো হয়েছে। হালকা সাজ অপটু হাতে। রাঙা চাচী চুল বাঁধলে আজ আরো সুন্দর লাগতো। কিন্তু তিনি আসেন নাই আজ এ বাড়ির সীমানায়।

বাড়ির পিছনে মধুমতি। নববধূকে নিয়ে যাবার জন্য তীরে নৌকা বাঁধা রয়েছে। পাড়ার চাচী-ফুফুরা ফুলিকে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে কয়েক জন বান্ধবী চোখ মুছতে মুছতে এগুচ্ছে।

সেই সরু ক্ষেতের আল দিয়ে যাচ্ছে। দু'পাশের ধান ক্ষেতে বাতাস বয়ে যাচ্ছে শন্ শন্---ফুলির বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। সেই চিরচেনা প্রিয় পথটা দিয়ে আজ যেতে ভিতরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার লালিত স্বপ্ন ক্ষেতের গাছ-গুল্মগুলো লাল আঁচল ধরে টানছে। তাদের খেলার সাথীকে বলছে, একটু থামো।

ফুলি হোঁচট খায়। ঘাটের কাছে এসে গেছে এবার নৌকায় উঠতে হবে। আর এগুতে ইচ্ছে হয় না। পিছনে তাকিয়ে দেখে জামগাছের নিচে রাঙাচাচী ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। আর ফুলির চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখছেন। হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে রাঙ্গাচাচী গলা জড়িয়ে ধরে 'আমি পারলাম না মা, আমাকে মাফ করে দিস।' বলেই রাঙ্গাচাচী চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করেন। ফুলি মূর্ছা প্রায়।

ফুলিকে ওরা নৌকায় উঠায়। পিছনে চেয়ে দেখে পারে সারি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সকলে। নৌকার বাঁধন খুলে দেয় মাঝি। পালে হাওয়া লেগেছে। নৌকা চলতে শুরু করলো। পাশের ইটনা গ্রামের পানে।

গ্রামের হাট-বাজার তেমন একটা জমে না যুদ্ধের কারণে। মাঝেমাঝে মিলিটারি হানা দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। হতাহতও হয় প্রচুর। সারাদেশে এমনই ভয়াবহ অবস্থা।

একটি টিনের ঘরে অসুস্থ বৃদ্ধা খক্খকিয়ে কাশি দিচ্ছে। জমির মাস্টার পাঞ্জাবী গায়ে জড়িয়ে বের হচ্ছে।

কই যাস জমির?

মা, হাট থেকে একটু ঘুরে আসি।

বেশি দেরী করিস না। দিনকাল ভালো না।'

'বউ-বাজারের ব্যাগটা দাওতো একটু ঘুরে আসি আর হাঁস মুরগির খোপে সকাল সকাল দরজা দিও। শিয়ালের উৎপাত বড় বাড়ছে।' ফুলিকে বলে জমির মাস্টার সেই কখন বের হয়েছেন। এখনো আসেন নাই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। ফুলির কেমন যেন দুশ্চিন্তা লাগছে ।

হাঁস-মুরগির ঘরে দরজা লাগাতে গেলে গুলির শব্দে হাঁস-মুরগিগুলো ডেকে ওঠে। ফুলির হাত কেঁপে ওঠে। বৃদ্ধা ডাক ছাড়েন 'বউ, গুলির আওয়াজ মনে হয়-আমার জমির ঘরে ফিরছে?'

'না এখনো ফিরেন নাই। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে ঠিকমতো ফিরবেন ইনশাল্লাহ।' ফুলি হারিকেন পরিষ্কার করে আলো জ্বালায়। জমির মাস্টারের

বাজারের আশায় আর না থেকে ফুলি আজ খিচুড়ি রান্না করে, আর ঘরে থাকা ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দেয়।

চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেছে। বাড়িতে এখনো মাস্টার সাহেব ফিরেন নাই। ও ঘরে অসুস্থ শাশুড়ি উদ্বিগ্ন তার ছেলের জন্য। বারান্দার অর্ধেকটা ঘেরা ছোট্ট একটা রুম। একটা ছোট চৌকি পাতা আছে। অসুস্থ একজনকে কাঁধে ধরে এনে চৌকিতে আস্তে বসিয়ে দিয়ে হাঁক ছাড়েন ফুলির উদ্দেশ্যে--'বৌ বাতিটা আনো তো।' ফুলি নিয়ে আসে। মাস্টার সাহেব বলেন ---'ডেটল আর পাতলা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এসো।' ফুলি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। পায়ে আঘাত লেগেছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে ব্যান্ডেজ করে দিল।

লোকটা ব্যথায় কাতরাচ্ছে। পাশে রাখা বন্দুক। ইশারায় পানি খেতে চাইছে। পানির গ্লাস এনে ফুলি মাস্টার সাহেবের হাতে দেয়। মাস্টার সাহেব লোকটির পিঠে হাত দিয়ে সাবধানে আলতো করে তুলে পানি খাওয়ান। ফুলি বাতিটা এগিয়ে নিয়ে আসে কাছে। আরো কাছে, মুখের কাছে, গাল ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এলোমেলো চুলওয়ালা লোকটিকে দেখে ফুলি চমকে ওঠে।

হৃদপিণ্ডে যেন হাতুড়ি পিটাচ্ছে টিপ্ টিপ্ টিপ্। মাস্টার সাহেব বলেন 'খাবার ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি।' ফুলি খাবার এনে সযত্নে চৌকির পাশে রাখলো। এতক্ষণ জমির মাস্টার নিজে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। লোকটি ঘুমিয়ে পড়েছে । আবার আস্তে আস্তে ডাক দিলেন খাওয়ার জন্য। ফুলি ঘোমটা টেনে দরজার সামনে দাঁড়ালো খুব তাড়াহুড়ো করে বড় বড় হা করে খাচ্ছে। '--ইস্ কতদিন অভুক্ত' ফুলি ভাবছে। ভালো-মন্দ তো দূরের কথা হয়তো পেট পুরেও খায় না বহুদিন। দুচোখে বৃষ্টির ধারা নেমে এল আড়ালেই মুছে নিলো। মনে হচ্ছে আজ লোকটি পৃথিবীর সব খাবার খেয়ে ফেলতে পারে। ফুলি সঙ্কুচিত পায়ে এগিয়ে গেল। 'আর একটা ডিম নিন' বলেই দ্বিধাগ্রস্ত হাতে খাবার তুলে দিলো। কণ্ঠস্বরটা বজ্রপাতের মতো লোকটির কর্ণে প্রবেশ করলো। মুখটা দেখার জন্যে তাকাতেই ঘোমটা আরো প্রলম্বিত হলো। যেন চেনা লোককে দেখলো অচেনার গাম্ভীর্যে। যুদ্ধ বাইরে, যুদ্ধ ভিতরে। বাইরের যুদ্ধ শত্রুর সাথে, ভিতরের যুদ্ধ নিজের সাথে। বাইরের যুদ্ধের খবর জানে বহির্বিশ্ব। কিন্তু অন্তরের যুদ্ধের খবর জানেন শুধু অন্তর্যামী।

রাতের আহার সেরে মাস্টার সাহেব সাইকেল নিয়ে বের হলেন ব্যথা কমানোর ঔষধ আনতে।

ফুলি একগ্লাস দুধ নিয়ে আহত যোদ্ধার ঘরে প্রবেশ করলো। লোকটির চোখে ঘুম নেই। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কি যেন ভাবছে । বড় কষ্টে ছাওয়া সে চাহনি । ফুলি পাশের টেবিলে গ্লাস রেখে বললো 'দুধটুকু খেয়ে নিন।' বলেই চলে যাওয়ার সময় লোকটি হাতটা ধরে সটান কাছে নিয়ে আসে। ঘোমটা পড়ে যায় চুলের খোঁপা খুলে যায়। চিরচেনা ফুলির মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায় এবার শফিক।

অস্ফুট স্বরে বলে-একি হচ্ছে?

শফিক বলে- 'ফুলি তুই কি করে পারলি? কোন অপরাধে চিরদিনের জন্য আমাকে দূরের করে দিলি?' নিরুত্তর ফুলি অঝোরে কেঁদেই চলছে। এতক্ষণে জমির মাস্টার

বাড়ি ফিরেছেন, সাইকেল থেকে নামতে নামতে--'বৌ একগ্লাস পানি আনোতো, ঔষধ পাওয়া গেছে।' ফুলি পানি পৌঁছে দিয়ে দ্রুত চলে যায়।

আজ নয় কোনো চাঁদনী রাত অথবা নেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা। তবুও রাতে দুচোখের পাতা এক করতে পারে না ফুলি। কত স্মৃতি, কত কথা, সুখ- দুঃখের ঘটনা একে একে মানসপটে ভেসে বেড়াচ্ছে।

'যেখানে একটা স্বপ্ন ছিল, সবুজ খোলা মাঠ ছিল, রঙিন ফুলের বাগান ছিল। বাহারী প্রজাপতি খেলা করতো সে বাগানে। নাম না জানা বুনো ফুলের সৌরভে গা ভেজাতো। সপ্তস্বরের ঢেউ খেলতো হৃদয়াকাশের বাতাসে বাতাসে। কল্পনার পাখা মেলে যাকে নিয়ে উড়েছে স্বপ্ন রাজ্যে। সেতো আজ কাছে। মাঝে একটি টিনের বেড়ার ব্যবধান মাত্র। কিন্তু এ বেড়া যে চীনের প্রাচীরের চাইতেও দীর্ঘ, আরো দৃঢ় আরো কঠিন। একে অতিক্রম করার সাধ্য ফুলির নেই। অন্তরের বয়ে চলা সাইক্লোনকে তার শান্ত-সৌম্য মূর্তির আড়ালে চাপা দিয়ে রাখে, চাপা দিতে হয়।

এক সময় ভোরের আজানও শেষ হয়ে যায়। হাঁস-মুরগিগুলো ডাকা-ডাকি শুরু করেছে। প্রত্যুষের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশে স্বামী জমিরমাস্টার বিভোরে ঘুমোচ্ছেন। ফুলি বিছানা ছেড়ে উঠে। অতি সন্তর্পণে দরজার খিড়কী খুলে শফিকের ঘরের দিকে যায়। ও ঘরের দরজা খোলা। ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু এ কি! বিছানায় নেই শফিক। এত অসুস্থ লোকটা এত ভোরে কোথায় গেল?

তাহলে? দুধের গ্লাসের দুধ একটুও কমেনি। সেভাবেই ঢাকা রয়েছে। গ্লাসটা হাতে তুলে নিলো। এক টুকরো কাগজ গ্লাসের নিচে চাপা ছিল। বুকটা দুর্ দুর্ করে কেঁপে উঠলো। কম্পিত হস্তে কাগজটা খুললো। শফিকের সেই চিরচেনা হাতের লেখা...

'সুখে থাকিস ফুলি।'

অপেক্ষা

ছোট্ট চন্দনা কিশোরীর মতো রিনিঝিনি নূপুরের ছন্দ তুলে এঁকেবেঁকে নেচে চলেছে রতনদিয়ার কোলঘেঁষে। অনেকদিন পর তার স্বচ্ছ টলটলে বুকের উপর দিয়ে নৌকায় চড়ে বাড়ি ফিরছে বর্ণ। সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু তমাল। দুজনে একই ক্লাসে। একই রুমে থাকে। ফাইনাল পরীক্ষার আগে এইবারই শেষ ছুটি। তমালের রতনদিয়া গ্রামটা দেখার বহুদিনের শখ। বর্ণের কাছে অনেক গল্প শুনেছে। শুনে শুনে মনে হয়েছে বহু আপন, যেন বহু দিনের চেনা। হেমন্তে চন্দনার জল অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। দু'ধারের উঁচু গাঙপাড়। নিচে জেগে উঠেছে কাশফুল ফোটা চর। গাঙশালিখগুলো মাটির গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কিচিরমিচির শব্দে মাতিয়ে তুলেছে চন্দনার পার। তমাল এ দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করলো পটাপট। নৌকাটা পড়ন্ত বিকেলে চন্দনার রঙিন জলে ঢেউ তুলে বর্ণদের বাড়ির ঘাটে ভিড়ে সন্ধ্যার একটু আগে। কাঁচা মাটির রাস্তাটা সর্পিল রেখায় সোজা চলে গিয়েছে তাদের কাচারিঘরের সামনে। রাস্তার পাশে শস্যক্ষেত বেষ্টিত কৃষাণীর একচালা ঘর। চালে মাচার উপর লাউয়ের ডগায় ভর করে কুয়াশা নেমেছে মাত্র। হরি গাছি মাটির ঠিলা খেজুর গাছে ঝুলিয়ে নিচে নেমে এল। কোমরের কাছা থেকে ধারালো ছেনিটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে-

আরে আমাদের বর্ণ না?

হ্যাঁ হরিদা, তুমি কেমন আছ?

এই আছি ভালো ভগবানের ইচ্ছায়। তোমার খবর কি? পাশ দিয়ে ফেলিছ কি?

না হরিদা,পরীক্ষার এখনো কয়েক মাস দেরি আছে। তাই তোমাদের সাথে দেখা করতে বাড়ি চলে এলাম।

বেশ করিছ। তো উনি কে গো? উনাকে তো কোনোদিন দেখিছি বলে মনে হয় না।

ও আমার বন্ধু তমাল। আমাদের গাঁয়ে নিয়ে এলাম বেড়াতে।

খুব ভালো কাজ করিছ। আচ্ছা তোমরা বাড়ি যাও। সকালে গাছের প্রথম কাটা রস পাঠিয়ে দিবোনে। বন্ধুকে নিয়ে খাই নিও।

আচ্ছা হরিদা চলি। হরি গাছি দুহাত জড়ো করে কপালে ছোঁয়ালো।

মাটির উঠোনে জলচৌকিতে বসে বদনার জলে অজু করেন হাশেম আলী মাস্টার। বারান্দার কোণে পেতে রাখা ছোট্ট নামাজের চৌকিতে গিয়ে দাঁড়ান। সন্ধি হারিকেনে আগুন ধরিয়ে বাবার নামাযের চকির পাশে রেখে চুল বাঁধতে বসলো। মা রান্না ঘরে কুপি জ্বালিয়ে ভাত রাঁধছেন। ছোট মেয়ে কথা মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে পাটকাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকাআঁকি করছিল। এবার ক্ষান্ত দিয়ে কাপড়ের পুতুলটা নাড়াচাড়া করছে আর ছড়া কাটছে–

'আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ,

এত ডাকি তবু কথা কও না কেন বৌ।'

কাছারির কাছ থেকে ডাক আসে-'ক-থা, কথা ম-নি।' বড় ভাইয়ের কণ্ঠ চিনতে ভুল হয়নি সন্ধিরও। পিঠে ফুল তোলা চুলের বিনুনী দুলিয়ে দৌড়। সন্ধি বর্ণের হাত থেকে ব্যাগটা নেয়। তমালকে দেখিয়ে বলে 'এই হলো আমাদের সন্ধিমালা। কথা কোথায়?' একটু লজ্জা পেয়ে সন্ধি সালাম জানালো।

ততক্ষণে কথাসহ মা হারিকেন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কথা ব্যাগটা ধরে টানাটানি করছে। খোলার জন্য অস্থির। বর্ণ ব্যাগ থেকে সন্ধির জন্য ভেলভেটের চুলের ফিতা আর কথার জন্য একটি নতুন শ্লেট-পেন্সিল বের করে দেয়। খুশিতে তখনই কথা নিয়ে যায় বাবার কাছে। অ-আ শিখবে, লিখে দিতে বলে।

বর্ণের বাড়ি আসার খবর পেয়ে বরকত শেখ এসেছেন। তিনিও হাসেম আলী মাস্টারের সাথে স্কুলে মাস্টারি করেন। তার মেয়ে উপমা সন্ধির বান্ধবী। এবার মেট্রিক পরীক্ষা দিবে। রাতে খাবার শেষে সবাই মিলে নানান গল্পে বসলেন। পরদিন বন্ধু তমালকে নিয়ে তাদের বাড়ি বেড়াতে বলে গেলেন।

সকালে বেশ কিছু পিঠা নিয়ে উপমা এসে হাজির। তমালের সাথে পরিচয় হলো উপমার। ছবি তোলার জন্য ভীষণ উপযোগী বর্ণদের গ্রামটা। তাই এদিক সেদিক গিয়ে ছবি তুলছে তমাল। বাড়ির সামনে কাছারির ধারে দুটো শিমুল গাছের পাতা ঝরতে শুরু করেছে। বসন্তে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তার ডালে বসে হলুদ পাখিটি যখন গান গায় সে মনোরম দৃশ্যটা যদি তমালকে দেখানো যেত। তখন এলে দেখতে পেত গ্রামটা কত রঙিন। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের একধারে সবুজ শিম-কলাই,আর একধারে সরিষা ফুলের হলুদ কার্পেট, পাশে লাল শিমুলের পতাকার তলে বাসন্তী পাখির মিষ্টি গান, কী চমৎকার!

সবাই মিলে যখন গল্প করছিল তখন মায়ের ডাক এল। রাজহাঁসটা ধরতে হবে আজ মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। সন্ধি মায়ের কাছে গেল। কথা ও তমাল ছবি তোলায় ব্যস্ত। নীরবতা ভঙ্গ করে উপমা বর্ণকে শুধোয়-শুনলাম আপনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং মিছিলে যান?

তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?

শুনলাম। কিন্তু সত্যি কিনা বলেন?

হ্যাঁ সত্যি।

আমার ভীষণ ভয় করে। কেন যান? ও সবে কি লাভ?

চেয়ে দেখোতো। ঐ ঐখানে। উঠোনের পেয়ারা গাছটার ডালে। কি দেখলে?

পাখি দুটো কিচিরমিচির করছে।

তোমার আমার কাছে এটা কিচিরমিচির। কিন্তু আসলে ওরা কথা বলছে। দুজনে দুজনের মনের ভাব বিনিময় করছে ওদের নিজস্ব ভাষায়। ভেবে দেখ একটা বনের পাখিরও নিজের ভাষা আছে আর আমাদের? আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারবো না। মনের ভাব বিনিময় করতে অন্য ভাষার আশ্রয় নিতে হবে? আচ্ছা, তুমি কি পারবে এখন থেকে আমার সাথে উর্দু ভাষায় কথা বলতে? ওরে বাবা, অসম্ভব।

তাহলে? উর্দুতে আমাদের কোনও এলার্জি নেই। দুটো ভাষা পাশাপাশি ব্যবহারে কোনো বিরোধও নেই। আমরা বাংলা ও উর্দুকে সমান ভাবে চাই। কিন্তু আপনারা মাত্র ছাত্র। কীভাবে এর সমাধান করবেন?

আমরা ছাত্র আমরা বল, আমরা ছাত্র দল...। আমরা প্রতিবাদ করতে চাই। হরতাল দিয়ে বিক্ষোভ করতে চাই।

কি করবেন? বিক্ষোভ?

হ্যাঁ, দেখো না আমরা কি করতে পারি।

বর্ণের কথাগুলো উপমা বুঝলো কিনা তা বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে বললো '-দাদি বলছেন কবরে যাওনের আগে নাতজামাই-এর মুখ দেখে যেতে চাই। আব্বা বলেছে মেট্রিক পরীক্ষা শেষ হলেই...।'

কক কক আওয়াজে রাজহাঁস দুটো বাড়ি মাতিয়ে তুলেছে খাবার দিতে দেরি হওয়ায়। উঠোনের এক প্রান্তে খাদ্যের সন্ধানে মুরগি তার ছানার দল নিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ছানাগুলো মায়ের চারপাশে চিঁ চিঁ করছে। শীতের সোনালি রৌদ্রে রাজহাঁসের থলথলে শরীরটা বেশ চকচক করছে। মাঝে মাঝে মুরগি ছানাগুলোকে ঠোকর দিতে গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে বাচ্চাগুলো নিরাপত্তার সন্ধানে মায়ের পাখনার নিচে লুকায়। বাচ্চাদের নিরাপত্তা দিতে মা সজারুর মতো ঘাড়ের পাখনা ফুলিয়ে দ্বিগুণ উচ্চ স্বরে এগিয়ে এসে কক্ কক্ করে প্রতিবাদ করছে। মা বললেন সন্ধিকে 'ওটাকে পোলো দিয়ে আটকাতে হবে।'

গ্রামের ছবি, ক্ষেতের ছবি, কলমীলতার ছবি, ডোবা ভরা কচুরী ফুলের ছবি, এমন কি সন্ধির মুরগিছানার ছবিও তুললো তমাল। শিমুলের ডাল থেকে শুকনো পাতা ঝরছে। নতুন কুঁড়িতে ডাল ভরে গিয়েছে। ফাগুনে ডালে ডালে আগুন লাগবে। তমালের ইচ্ছা আর এক বার এসে সে ছবি তুলবে।

তমালের চাচা আকবর আলী সাহেব সরকারি বড় আমলা। তাঁর মেয়ে ফ্লোরাকে তমাল চাচির অনুরোধে মাঝে মাঝে বাসায় গিয়ে অংক করাতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চাপ বেড়ে যাওয়ায় এখন আর যায় না। তাছাড়া ফ্লোরা তেমন ভালো ছাত্রী না। পড়তে বসলে সিনেমার নায়িকাদের গল্প করে। নয়তো এটা ওটার গল্প করে। চাচির কথাবার্তা

ও মতিগতি তার ভালো লাগে না। দামি শাড়ি আর গহনাতে ভদ্রমহিলার ভারি আসক্তি। যা তমালের মতো আদর্শবাদী ছেলের মোটেও পছন্দ নয়।

আকবর সাহেব অফিসে সকল আমলাদের নিয়ে মিটিংয়ে বসেন। ভাষণ দেন-

'ওরা হরতাল ডেকেছে? এ হরতাল বন্ধ করতে হবে। হরতালে মাথা নোয়ানো যাবে না। সভা-সমিতি বন্ধ করতে হবে। রাস্তায় মিছিল বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে।'

ফ্লোরা একটা বোরখা পরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তমালের জন্য। তমাল মিটিং শেষে কাছ দিয়ে যেতেই মুখের কাপড়টা সরিয়ে ডাক দিল। তমাল অবাক এত আধুনিকা মেয়ের এ বেশ ধারণে। একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললো, আব্বা জানলে আমাকে খুন করে ফেলবে। খালার বাসায় যাবার কথা বলে গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছি। আব্বা বলেছে কাল তোমরা আন্দোলন করলে কঠিন হস্তে দমন করা হবে। তুমি ওসবে যেও না,তমাল ভাই। বাসায় চলে এসো। তুমি আসছো তো?

তমাল হাসে-দেখি। তুই এখন বাসায় যা, চল গাড়িতে উঠ।'

এদিকে মন্ত্রীরা সব ব্যস্ত। তারা সবাই একত্রে বসছেন। গদিগুলো দুলছে। আবার ছুটছেন। নেতারা সব তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠছেন। পাড়ায় পাড়ায় মাতব্বরদের ডাকা হচ্ছে। শলা-পরামর্শ চলছে। 'যত টাকা লাগে দেব। প্রয়োজনে পুলিশ দেবো। তবু হরতালের কাছে মাথা নোয়ানো যাবে না।'

মাতব্বররা ব্যাপারটা বুঝলেন। তারা মাথা দোলালেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। একুশের হরতালকে পণ্ড করার জন্য সন্ধ্যারাত্রিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় কতকগুলো কঠিন, ঋজু ও উদ্ধত মুখ। ওরা প্রতিবাদী। ওরা সমস্বরে চিৎকার করছে।

'সরকারের ১৪৪ ধারা মানি না।

আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

আমাদের অধিকার হরণ করতে পারবে না।

এ আদেশ আমরা মাথা পেতে নিবো না।'

মধুর ক্যান্টিন আজ মৌচাকে পরিণত হয়েছে। তিল ধারণের ক্ষমতা নেই।

তপ্ত চায়ের কাপ নিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওরা উত্তপ্ত।

'আইন জারি করে আমাদের শৃঙ্খলিত করবে?

পশু জানোয়ারের মতো খাঁচায় পুরে রাখবে?

নেতারা বললেন 'আইন অমান্য করা ঠিক হবে না। আমরা স্বাক্ষর গ্রহণ করবো। স্বাক্ষর গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবো।'

'না! না!! না!!!

তোমাদের কথা আর শুনবো না। তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছো। আমরা তোমাদের আর কোনও কথা শুনবো না। আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গবোই। আইনের বেড়ি জাল ছিঁড়বোই।'

পুলিশের কর্মকর্তা পকেটের পিস্তলে হাত রাখলেন। সিপাহীরা নির্বিকার। হুকুমের ক্রীতদাস তাই তাদের কোনও ভাবান্তর নেই। আমগাছ থেকে শুকনো পাতা অঝোরে ঝরছে।

বিশৃঙ্খলা করে নয়। দশ জন করে মিছিল বের করবো। যাবো এসেম্বলির পানে।

এই হলো আমাদের আজকের শপথ।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার গেটটা খুলে গেল। সিপাহীরা গেটের দিকে এগিয়ে এল। প্রথম দশজনের দল বেরিয়ে এল। কঠিন শপথে উজ্জ্বল দশটি মুখ। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। গগন বিদারী চিৎকার -রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

পুলিশের চকচকে বন্দুকের নলগুলো চারদিক ঘিরে ধরলো। দ্বিতীয়-তৃতীয়- চতুর্থ দল বেরিয়ে পড়লো। পুলিশ ধরে ধরে সবাইকে দুটো খালি ট্রাকে উঠালো। দলে দলে গাড়িতে উঠালো। আমতলা, মধুর ক্যান্টিন পুকুর পার চারদিক হতে শ্লোগান আসতে শুরু করলো। পুলিশের কর্মকর্তা হতবিহ্বল! একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙ্গে দিয়েছে!!

আর কত ধরবে!কত গাড়িতে উঠাবে!

কত জেলে নিবে!

ঢেউ এর পর ঢেউ যেন আসতে শুরু করলো স্রোতের মতো। জোয়ারের মতো। সমুদ্রের বানের মতো। সুনামীর মতো ওরা আসছে।

হঠাৎ চোখজ্বালা শুরু হয়। কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে। চোখে পানি দাও। পুকুরে ঝাঁপ দাও, পুরো এলাকাটা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেরা মেডিকেলের দিকে এগিয়ে গেল।

আমলা আকবর আলী গাড়িতে চড়ে তখন মেডিকেলের সামনে। মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ এবং মেডিকেল ছাত্রাবাস একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সারা পাকিস্তানে ঢাকা মেডিকেল কলেজই একমাত্র ব্যতিক্রম। যেখানে মুসলিম ছাত্রলীগ নামে কোনো কমিটি এ প্রতিষ্ঠানে নেই। এমনকি একজন সভ্য পর্যন্ত নাই। ছাত্র সংগ্রাম কমিটির প্রাণ এই মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ। এ কারণে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের প্রতি পুলিশের বিশেষ লক্ষ্য।

আমলা আকবর আলীর গাড়ি ছাত্রদের সামনে পড়ে। ছাত্ররা তাকে ঘিরে ধরলো । গাড়ি থামলো। চাকার হাওয়া ছেড়ে দিল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সোজা এক দৌড়ে রাস্তার পাশে পুলিশের বড় কর্মকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ছাত্ররা ড্রাইভারকে কলার ধরে নামিয়ে গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিল। কান ধরে উঠ বস করাচ্ছে। ড্রাইভার যখন বললো এটা আমলার গাড়ি, ম্যাচের কাঠিতে আগুন জ্বলে উঠলো।

আকবর সাহেব পুলিশের কর্মকর্তাকে ধমক দিলেন। রাস্তায় গুণ্ডা বদমায়েশরা কি করছে দেখতে পাচ্ছেন না? আর লাঠিপেটা বা কাঁদুনে গ্যাস নয়, গুলি থাকলে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিন।

মেডিকেলের ব্যারাকে অজস্র কাঁদুনে গ্যাসের বর্ষণ চলছে। বাধা প্রাপ্ত হয়ে ওরা দ্বিগুণ শক্তিতে ইট ছুঁড়ে। ইটের যুদ্ধ চলছে।

হঠাৎ শব্দ! গুলির শব্দ!!

আরো আরো শব্দ!

গুলি চালানোর ধরনটা একটু অন্য রকম। প্রথম কয়েক রাউন্ড গুলি মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস লক্ষ করেই চালানো হয়। এগার নম্বর সাত নম্বর তিন নম্বর ব্যারাকে ঘরের ভিতরে পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল ভেদ করে পড়ার টেবিলে, শোয়ার খাটে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়। এলোপাথাড়ি গুলি। বুঝতে দেরি হয় না মানুষ মারার জন্যই এ গুলি।

মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল সব। ছাত্র জনতা মানুষ সবাই।

সূর্যটা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। কাছারির পাশে শিমুল তলায় বসে উপমা ও সন্ধি। শিমুলের ডালে সোনালি রোদ লাল রং মেখে পথের ধারে লুটিয়ে পড়লো।

দাওয়ার ধারে মুরগিগুলো চালের খুঁদ খাচ্ছিল। উড়ন্ত একটি শকুন ছোঁ দিয়ে মায়ের বুক থেকে একটি ছানাকে তার ঠোঁটে তুলে নিয়ে গেল। মা মুরগি মুহূর্তেই ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে উঠে। সেই হঠাৎ শব্দে চমকে উঠে কথামালা। তার হাত থেকে মাটির শ্লেটটা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। একটি কাক আর্ত চিৎকারে বাড়ির উপর দিয়ে আকাশে উড়তে থাকলো।

ওরা গুলি করেছে। ছাত্ররা মারা গিয়েছে। কিন্তু কতজন? এক,দুই,তিন কিংবা অনেকজন। গাড়ির চাকা,কলের চাকা, দোকান-পাট সব বন্ধ। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। সরকারি লোকেরা তৎপর। রাতের আঁধারেই লাশগুলো মেডিকেলের মর্গ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ভোর হবার আগেই আজিমপুর গোরস্থানে লাশ দাফন করতে হবে। আমলা আকবর আলীর গাড়ির চাবিটা কোনো এক লাশের পকেটে আছে। তিনি রাতের আঁধারে মর্গে এলেন লাশের পকেট তল্লাশি করছে পুলিশ। দাফনের আগে নাম ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা। লিস্ট তৈরী করছে। একজনের পকেটে শুধু একটা চিঠি, অফিসার পড়ে দেখছেন। অক্ষরগুলো রক্তেভিজে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটি মেয়ের চিঠি, সে তার প্রথম ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। ইতি ফ্লোরা। আকবর সাহেব চমকে উঠলেন দ্রুত চিঠিটা হাতে নিলেন। মেয়ের হাতের লেখা স্পষ্ট চিনতে পারলেন। কনস্টেবলকে টর্চটা লাশের মুখের উপর ধরতে বললেন। তিনি ঘামছেন, টর্চের আলোয় ভাইয়ের ছেলে তমালের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। পাশের লাশটাও তিনি সনাক্ত করলেন। তাকেও তিনি চিনেন। তমালের সাথে তার বাসায় যেত। নাম তার বর্ণ। বাড়ি চন্দনার পারে রতনদিয়ায়।

নাড়ার আগুনে মা মুড়ি ভাঁজছেন। মাটির ঝাঁঝরিতে ফুটন্ত মুড়ি ঢেলেছেন মাত্র। তপ্ত বালু ঝরনা ধারায় নিচের পাত্রে ঝরছে। উপরের পাত্রে ফটফট শব্দে তখনো মুড়ি ফুটছে। নারিকেলের শলা কাঠি দিয়ে মা দ্রুত নাড়ছেন। পরীক্ষা শেষে ছেলে বর্ণ বাড়ি আসবে। গতবারের মতো দু'একজন বন্ধুকেও সাথে নিয়ে আসতে পারে। মা তাদের আপ্যায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাতাসে আমের মুকুল অঝোরে ঝরছে।

ইলিশ

সে বড় দুর্যোগের সময়। পদ্মায় গ্রাস করেছে ভিটে মাটি। মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই নাই। একেবারে নিঃস্ব। এদিকে গ্রামে তেমন কোনো কাজও নাই। অহর্নিশি উপোস থাকতে থাকতে বউবাচ্চাসহ একদিন লঞ্চে ওঠে তাহের আলী। 'ঢাকা এলে টাকা মেলে-' এই বিশ্বাসে তার রূপবন্তী পাচুরিয়া গ্রাম ছেড়ে ঢাকামুখি হয়। কিন্তু ঢাকায় এসে দেখে- এ এক অচিনপুরী। পথঘাট লোকজন সব কেমন যেন। এত মানুষ! কোথায় যায় কোথা থেকে আসে? সবাই ছুটছে আর ছুটছে। অস্থির পাখির মতো দূর থেকে কাছে - কাছে থেকে দূরে।

প্রশান্তির ডানা মেলে বসবে এমন শীতল স্নেহের ছায়া কোথায় পায়। সে সময় বশির মিয়ার সাথে পরিচয় সূত্রটা নিবিড় ঘনশ্যাম হয়ে এসেছিল তাহের আলির কাছে। যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ। পেশায় ঠেলাগাড়ি চালক। লোকটি মন্দ নয় যদিও একটু-আধটু বদঅভ্যাস আছে। কাজ তেমন একটা পায় না। হাতে পয়সাও থাকে না। অথচ অন্ধকার নেমে এলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। নেশায় ধরে। টাকা থাকলে মদ নইলে গাঁজা। স্ত্রী মরিয়ম ছুটা বুয়ার কাজ করে। সন্তান হারানোর দায়ে স্ত্রী তাকেই অভিযুক্ত করে। তার প্রতি ব্যথা ও ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে। সেদিন নয় মাসের পুত্রসন্তানকে তার কাছে রেখে মরিয়ম কাজে গিয়েছিল। একটু একটু করে হামাগুড়ি দিতে দিতে কখন যে শিশুটি ঘরের পিছনে রেললাইনের উপর চলে গিয়েছিল তার খেয়াল নাই। ট্রেনের গড় গড় শব্দে শিশুটির আর্তনাদ তেমন শোনা যায়নি। শুধু পাওয়া গিয়েছিল থ্যাৎলানো রক্ত মাখা একটা লাশ।

সমগ্র দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও মরিয়মের দু'চোখে ঘুম আসে না। সন্তান হারানোর ব্যথায় মরিয়ম গুমরে গুমরে উঠে। স্বামী নেশায় মগ্ন থাকে। রাতে বাড়ি নাও

আসতে পারে। একাগৃহে মৃত শিশুটির কাঁথা শূন্য বুকে জড়িয়ে কাঁদে সারারাত। তার চিত্তদাহ রাতের আঁধারের গায়ে মিশে রয়। তবুও জীবন তো থেমে থাকে না। ছুটে চলে সামনের দিকে। সকালে সে আবার যায় তার কর্তব্যে। কিন্তু স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে না কিছুতেই।

বশির মিয়ার মাধ্যমে তাহের আলী ঠাঁই পায় ঢাকার অতিপরিচিত ব্যস্ত স্থানে। যার পিছনে রেললাইন সামনে প্রধান সড়ক। মাঝে ফুটপাতের সরু জায়গা। ওটা এখন আর ফুটপাত নয় ক্রমবর্ধিষ্ণু বস্তি। পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ঘরগুলো। ওগুলো ঠিক ঘর নয়, ওগুলো ঝুপড়ি। সামনের রাস্তাটি ভীষণ ব্যস্ত। দিনে অসংখ্য গাড়ি আর মানুষের শব্দবাহী বাতাসে ভারাক্রান্ত। আর রাতে নিস্তব্ধতা ভেদ করে সড়কের বুক বিদীর্ণ করে নিঃশঙ্ক চিত্তে চলে বড় বড় গাড়ি- লরি আর ট্রাক। যেখানে জীবন আর মরণের শুভ দৃষ্টি বিনিময় হয় মাঝে মাঝে। বস্তিতে থাকার সংকুলান হলেও তাহের আলীর মন পড়ে রয় তার পূর্বপুরুষের বাসস্থান সেই স্মৃতিময় গাঁয়ে। যা তার এক অতীত স্বপ্নসম। নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালিয়েছে বাপ দাদারা স্বাচ্ছন্দ্যে। মাত্র দু'পুরুষের ব্যবধানে এখন বস্তিবাসী। নিজে রিক্সা চালায়। বউ কাজের বুয়া। আর ছেলে জামাল ও কামাল কাগজ টোকায়। এটাই হালচিত্র।

গতকাল সন্ধ্যায় যখন কাগজ টোকাতে গিয়েছিল দুভাই, কোনও এক বাসার ছাদ থেকে প্রায় নতুন একটা ফুটবল পড়ে নিচে। ত্বরিত গতিতে বলটি বস্তায় ঢুকিয়ে বিলম্ব না করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। প্রাপ্তি সূত্রে মালিক এখন দু'ভাই। নতুন বল কেনা সামর্থ্যের বাইরে তাই এতদিন কাগজ গুটিয়ে বল বানিয়ে খেলা করতো। সকল কিশোরদের মতো ওদেরও রয়েছে ফুটবল প্রীতি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দোকানের টিভিতে বল খেলা দেখে আর ভিতরে ভিতরে ম্যারাডোনা, রোনাল্ডো হবার স্বপ্ন জাগে। কাগজ টোকাতে গিয়ে অনেক জিনিসইতো মাঝে মাঝে পায়। কিন্তু বহুকাঙ্খিত বস্তুটি অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে যাওয়ায় ওরা মহাখুশি। কাগজ টোকাতে আজ আর যায় নাই। বল নিয়ে মাতামাতি সারাদিন।

ইদানিং অন্যরকম বাতাস বইছে সর্বত্র। সে হাওয়া বস্তিতেও প্রসারিত। প্রচারকদের বেশ সমাগম। প্রলোভন আর চাটূক্তিতে মন ভরিয়ে দেয়। গতবার খায়েকুল ভাই বলেছিল কলাগাছ- মার্কায় ভোট দিলে বস্তিতে বিল্ডিং উঠিয়ে দিবে। বঞ্চিত হৃদয় প্রলুব্ধ হয় বার বার। বিশ্বপালক প্রদত্ত এমন জনদরদী মন সবার আছে কি? যে হৃদয় গরিবের দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হয়ে বেদনার ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয়। অতি পুরাতন বস্তিবাসিন্দা যারা, তারা জানে ওরা কথার বাস্তবায়ন কতটুকু করে। দ্বিধাগ্রস্ত হয় বার বার। কে আসল জন দরদি। কাকে দিবে ভোট তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। হাতড়ে উত্তর খুঁজে পায় না। অতকিছু তারা বুঝে না, শুধু বুঝে এখন-

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক।
লাভ কি শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে যে বিরাট ফাঁক।'

এ ব্যবধান আজকের নয়। এ ব্যবধান জন্মান্তরের। জন্মই যাদের আজন্ম অভিশাপ। যাদের প্রতিদিনের সূর্য এসে ডাক দিয়ে তোলে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার প্রস্তুতির জন্য। এ নিয়ে এখন আর ভাবনা নেই। আগামীকাল ঐতিহাসিক জনসভা।

কার মিটিং-মিছিলে কত বেশি লোক জড়ো হয় এটাও একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপার। পার্টির লোকের সাথে বস্তিলিডার জাহাঙ্গীরের দর কষাকষি হয়।

'গতকাল কদম ফুল মার্কার মিছিলে গ্যাছিলাম মাথা পিছু নগদ ট্যাহা আর নাস্তা দিছে। এখন আপনেরা র‍্যাট একটু বাড়াইয়া দিবেন।'

তাতেও রাজী। মিছিলে লোকের প্রয়োজন- প্রয়োজন আজ বস্তিবাসীর। শর্ত মতে নির্ধারিত লোক যেন কম না হয়, তাহলে অসুবিধা আছে। পার্টির লোক বস্তির লিডার জাহাঙ্গীরের হাতে অগ্রিম কিছু বখশিশ গুঁজে দেয়। এই জাহাঙ্গীররা বার বার বিক্রি হতে হতে ওরা নিজেদের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রতিবারই দর কষাকষি করতে হয়।

লিডার জাহাঙ্গীর বস্তিতে সন্ধ্যায় এসে জানায় আগামীকাল একটা কাজ পাওয়া গেছে। সবার জন্য অপেক্ষা করে বেশ কিছুক্ষণ। অনেকেই তখনও কাজ থেকে ফিরে আসে নাই। রাত বেড়ে যাচ্ছে, অন্য কাজের তাড়া আছে। তাই বশির মিয়া ও নিয়ামত আলীকে মিছিলে নেওয়ার দায়িত্বটা দিয়ে যায় তাহের আলীকে। তাদের টাকাগুলোও বুঝিয়ে দেয়। তবে টাকার বিনিময়ে লোকের সংখ্যা অবশ্যই বুঝে নিবে লিডার।

শূন্যহস্তে নগদ কিছু টাকা অনাকাঙ্খিত রত্নসম। তাহের আলীর মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠে। তার স্ত্রীকে ডাকে 'ও ছালুনী, কালকা বিয়ান বেলা হগলে কামে যাওনের আগে আমারে ডাইক্যা দিস।' ছেলে এসে আবদার ধরে 'বাজান কালক্যা একটা ইলিশ মাছ আইনো। কদ্দিন পেট ভইরা খাই না।'

ইলিশ! তাহের আলীর চোখে ঝিলকিয়ে ওঠে সেই পাঁচুরিয়া হাটে পদ্মার ইলিশ। রূপার মতো চকচকে ইলিশ। রূপশালী ধানের ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজি। আহ্ কি তার স্বাদ! কি তার ঘ্রাণ! খুশবু এখনো যেন বাতাসের গায়ে!

বড় ভাইয়ের কথার জের ধরে ছোট ভাই কামালও বলে, 'হ বাজান মাছ আইনো।' ভোরে তাহের আলী সবাইকে জানায় 'আইজ বইকালে ঐতিহাসিক জনসভায় যাইতে হইবো। নগদ ট্যাকা ও নাস্তা দিবো।'

কিন্তু এদিকে নেয়ামত আলী রাজী নয় যেতে। সে বার বার ঈমান ভাঙ্গে না। যাকে ভোট দিবে, তারই মিছিলে যাবে। তার কাছ থেকে টাকা নিতেও আপত্তি নাই। তাই গতকাল আল্‌হাজ দান-এ-বীর সাহেবের 'কদম ফুল' মার্কার মিছিল করেছে ঠিকই কিন্তু আজ সে পালকি মার্কার মিছিলে যাবে না।

ছেলেটি ব্যাগ এগিয়ে দেয়। তাহের আলী যায় বাজারের দিকে। বাজারে এসে দেখে তার ভাগে পাওয়া টাকা দিয়ে একটি আস্ত ইলিশ মাছ কেনা সম্ভব নয়। আর অন্য কিছু কিনবে কি দিয়ে? মাছের সাথে অন্তত ভাততো দরকার। তাহলে কি বাদ দিবে ইলিশ কেনা?

ছেলেটা যে বসে আছে বাবার বাজারের অপেক্ষায়। ছেলেবেলায় সেও কত আবদার ধরেছে বাপজানের কাছে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে উড়াকান্দির মেলায় নিয়ে যেত। উড়াকান্দির মেলা থেকে কদমা-বাতাসা, মিছরি, মাটির হাতি-ঘোড়া, কাঠের তরবারী কত কি কিনেছে। দুধারে ভাঁট ফুল ফোটা মেঠো পথ দিয়ে বাবার কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যা বেলায়। কত যে আনন্দ ছিল তাতে। আজ হাতি নয় ঘোড়া নয়, একটু

ইলিশ মাছ দিয়ে পেট ভরে দুটো ভাত খেতে চেয়েছে ছেলেটি। ছেলের এই একটি আবদার কি বাবা মিটাতে পারবে না?

হঠাৎ বুদ্ধি আসে। নেয়ামত আলী আজ এই মিছিলে যাবে না। তার টাকাগুলো তাহের আলীর কাছে জমা আছে। তার বদলে আজ ছেলে জামালকে মিছিলে নিলে কেমন হয়? বয়স তের-চৌদ্দ। গায়ে গতরে বেশ ডাগর দেখায়। লুঙ্গি পরলে আরো বড় লাগে। ওকে নিলে তার ভাগের টাকাও বাজারে ব্যয় করতে পারবে।

চমৎকার চিন্তা! নিজের বুদ্ধির জন্য নিজেকেই ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। এক ভাগা ইলিশ মাছ কিনে। মনের আনন্দে বাজার করে স্ত্রী ছালুনীর হাতে তুলে দেয়। ছালুনী স্বামীর হাত থেকে বাজারের থলেটা নিয়ে খুশিতে টগ্‌বগ হয়ে গেল রান্নার আয়োজন করতে। মিছিল থেকে আসার পর রাতে স্বামী-সন্তানসহ একসাথে খাবে। তাহের আলী জামালকে বলে 'চল বাজান পালকি মার্কার মিছিলে যাই।'

জামাল মিছিলে যাবার আনন্দে লাফিয়ে উঠে। তাহের আলী ছেলেকে শ্লোগান মুখস্থ করায়।

'গরীবুল ভাইয়ের মার্কা কি।'

জামাল বলে-'পালকি পালকি।'

তাহের আলী বলে 'ভুল করিস না বাজান, পালকি-পালকি।' ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক একটু আগেও ছোটভাইয়ের সাথে বল খেলছিল। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন নতুন দলের নতুন নতুন শ্লোগান। অতকিছু মাথায় রাখা কষ্টকর। সে শুধু জেনেছে আজ মিছিল থেকে ফিরে ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবে। জামাল দ্রুত তৈরি হয় অপেক্ষাকৃত ভালো পোশাকে। মা ছালুনী ছেলের মাথার চুল আচঁড়িয়ে দেয়। পাশে থেকে মরিয়ম চেয়ে চেয়ে দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার শিশুপুত্রটি ট্রেনে কাটা না পড়লে হয়তো একদিন বড় হয়ে জামালের মতো তার বাবার সাথে মিছিলে যেত। কিছু বাড়তি টাকা সেও পেত।

বশির মিয়ার আজ খুশির দিন। ঠেলা না চালিয়েও নগদ টাকা হাতে পেয়েছে। মিছিলে অবশ্য যেতেই হবে। নইলে টাকা ফেরত চাইবে লিডার জাহাঙ্গীর। বশির মিয়া মিছিল থেকে ফিরে এ টাকা দিয়ে আজ নেশা করবে। নেশায় ধরলে সে আর কাউকে চিনে না।

বস্তির সবাই প্রস্তুত ঐতিহাসিক ময়দানে যাবার জন্য। ব্যানার প্লেকার্ড হাতে হাতে। 'তোমার আমার মার্কা কি?'

'পালকি'। দু'বার বললে জোর হবে শ্লোগানের। সবাই বলে 'হ-হ জোর হইবো।' পালকি পালকি।' জাহাঙ্গীর লিডার সতর্ক করে 'খবরদার মার্কা আবার ভুল কইরা ফেলাস না।'

মিছিল শুরু হলো। সকলে বের হয়। সড়ক থেকে প্রধান সড়কে। তারপর মহাসড়কে। মুষ্টিবদ্ধ হাতে শ্লোগানে মুখরিত মিছিল। মিছিল চলছে-চলছে। ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ পানে।

হঠাৎ প্রতিপক্ষের ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া। ঢিল ছোড়াছুড়ি-ইট ছোড়াছুড়ি। একসময় কাঁদানে গ্যাসে চোখ ঝাঁঝিয়ে যায়। শব্দ--ভীষণ শব্দ--গুলির শব্দ। এলোপাথাড়ি গুলি। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মিছিল। কে কোথায় পালায়!

তাহের আলী ডাকে সন্তানকে 'জামালরে'---। প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে চিৎকার- বা-জা-ন। আর শোনা গেল না।

এতক্ষণ তাহের আলী একটি নিরাপদ কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। আস্তে আস্তে সমস্ত শব্দ থেমে যায়। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তাহের আলী বের হয় তার সন্তানের খোঁজে। এদিক ওদিক খুঁজছে। ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে আর নয় সন্তানকে নিয়ে ছালুনীর কাছে ফিরে যাবে। রাস্তার এধারে ওধারে খুঁজছে কিন্তু কোথাও নেই। একটি লাশ নিয়ে একটি খণ্ড মিছিল বের হলো। তাহের আলী দাঁড়িয়ে যায়।

লাশের মুখ দিয়ে তাজা রক্ত ঝরছে তখনো। কেউ বলছে একনিষ্ঠ কর্মী, কেউ বলছে উদীয়মান ছাত্রনেতা। যাহোক- লাশ নিয়ে এগুচ্ছে সবাই। দলের লোক, পার্টির লোক মারা গিয়েছে প্রতিবাদ সভা করতে হবে। মিছিলের সামনে ফটোগ্রাফার- সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছে। ছবি তুলছে লাশের। টিভি ক্যামেরাও হাজির। রিপোর্টিং করছে, শট নিচ্ছে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে। মিছিল চলছে আর মিছিলের পিছু পিছু তাহের আলী ছুটছে----

'বাজান! বাজান আমার! বাজানরে আমার বুকে দেন।'

গায়েন

ঘাটের নির্দিষ্ট কোনোস্থান নেই যেখানে লঞ্চ এসে প্রতিদিন থামবে বা ছাড়বে। নেই কোনও সাইন বোর্ড। প্রকৃতি প্রদত্ত চিত্রই বলে দেয় এটা কোনো গ্রামের ঘাট। সারেং তার সুবিধামত কোনো একস্থানে লঞ্চ দাঁড় করায়। কাঠের সিঁড়ি মাটির দিকে নামিয়ে দেয়। সাথে লম্বা বাঁশের হাতল। পারের মাটির খাঁজে খাঁজে পা রেখে লঞ্চে উঠানামা করে সব যাত্রীরা।

নদীর পার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এখন নিবারণের বাড়ির কাছে চলে এসেছে। প্রতিদিন সকালে নিবারণ যখন তার কিশোরী কন্যা সুখলতাকে নিয়ে কাপড় কাচতে আসে, তখন একটি লঞ্চ মধুমতির বুকে ঢেউ তুলে উজানে যায়। আর সন্ধ্যায় যখন সুখলতা তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে মাটির উনুনে ভাত সিদ্ধ করতে থাকে তখন সেটা ফিরে। লঞ্চ দিনে দু'বারই আসা যাওয়া করে মধুমতির এ পথ বেয়ে ফুকরা গ্রামের উপর দিয়ে।

ঘাটে আসার আগে হবি কেরানী হাঁক ছাড়ে - 'আগায় আসেন, ফুকরা ঘাট আইসে গ্যেছে।' কিছু যাত্রী নামে ঘাটে। আর তীরে আমগাছের নিচে অপেক্ষমান যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে লঞ্চে উঠে আসে। যাত্রী রেখে লঞ্চ ছেড়ে যাবার ঘটনা কখনো ঘটে না। বরং দূর থেকে যদি কোনো যাত্রী হাত ইশারা করে তখন সারেং তার জন্যও অপেক্ষা করে ।

ঘাটে যাত্রীদের বসার কোনো ব্যবস্থা নাই। তীরে কাঠের গুঁড়িতে অথবা একটু দূরে ঝাউগাছের নিচে বাঁশের মাচানে বসে অপেক্ষা করতে হয়। তাতেও কেউ অধৈর্য হয়ে যায় না কারণ এখানকার যাত্রীরা এভাবে চলাচলে অভ্যস্ত। অপেক্ষমান যাত্রীদের সময়

কাটে পান-তামাক খেয়ে গল্প-গুজব করে। যাত্রীরা প্রায় সকলেই সকলের পরিচিত। আর ঘাটে এসে দেখাও হয় অনেকের সাথে। কারণ ইটনা, ফুকরা, ডিক্রিরচর, মাঠলা, দূর্গাপুর, বরফা, পরপর ছোট ছোট সে গ্রামগুলো। এ গ্রামে কারো মামাবাড়ি ওগ্রামে কারো শ্বশুরবাড়ি। এ ওর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংবাদও পাঠায় নিকট আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধবের কাছে। প্রায় প্রতিটা ঘাটেই থামে লঞ্চ। যাত্রী ও মালপত্রের সাথে সাথে লঞ্চে উঠে গুড়ের সন্দেশ, মুড়ি, চানাচুর, সিদ্ধডিম, কাঁচা-গোল্লা ইত্যাদি । যারা নিয়মিত যাত্রী তারা উঠেই অর্ডার দেয় 'চা পাঠাও।' গায়েন কই এদিকে আসো, শুরু কর বাবা।'

ছিপছিপে লম্বা তেলমাখা চুলে সুন্দর লম্বা সিঁথিকাটা। মিষ্টি কালো মুখশ্রীর অন্ধযুবক মোহন গায়েন। কোথায় তার বাড়িঘর কোথায় বাবা-মা কীভাবে লঞ্চে এল তা সে নিজেও জানে না। লঞ্চে সেই ছোট বেলা থেকেই। লঞ্চেই কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর কাল। গায়েনের লঞ্চের প্রতিটি দরজা-জানালা-কাঠ মুখস্থ। ছুঁয়েই বলতে পারে। সৃষ্টিকর্তা দুটি চোখের আলো জন্ম থেকে না দিলেও অদ্ভুত সুর দিয়েছেন তার কণ্ঠে। কোনো চর্চা ছাড়াই চমৎকার হামদ্-নাত পল্লীগীতি-ভাটিয়ালী গায়। যারা এ লঞ্চে আসা যাওয়া করে তারা সবাই জানে তার সুরের প্রতিভা। মুগ্ধ-শ্রোতারা বখশিস দেয়। কেউ কেউ এটা ওটা কিনে খাওয়ায়।

প্রতিদিন সকালে ঝুড়িভরা কাপড় মাথায় নিয়ে নিবারণ আসে নদীঘাটে। সাথে সুখলতার হাতে থাকে খাঁজ কাটা দুটো কাঠের তক্তা। তক্তার একপাশ নদীর পারে মাটিতে দণ্ডায়মান মোটা লাঠির উপর খাড়া করানো, অপরপ্রান্ত পানিতে ডুবে থাকে। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচে ধোপা ও তারকন্যা। সুখলতা কাপড় কাচে আর অপেক্ষায় থাকে কখন লঞ্চটি আসবে। লঞ্চের ঢেউয়ের পানিতে কোমর ভিজাতে সে বড় সুখ পায়। আরো সুখ পায় যখন লঞ্চের ভিতর থেকে কানে আসে মোহনের গান। লঞ্চ চলে যাবার পরও বহুদূর পর্যন্ত বাতাসে ভাসে সুর। যে সুর সে দূর থেকেই শোনে প্রতিদিন। কোনোদিন সামনে বসে তার গান শোনার সুযোগ হয়নি। ইচ্ছে হয় লঞ্চের যাত্রী হয়ে সারাদিন মোহন গায়েনের গান শুনতে।

'আমি হাড় কালা করলাম রে ও মোর দেহকালার লাগি।
অন্তর কালা করলামরে ...'

সুখলতার গা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। ভিতরটা হু হু করে। পুরো গানটা কোনোদিন ভালোমতো শুনতেও পারেনি সে। লঞ্চ চলে যাওয়ার পরও কান পেতে রয় শোনার চেষ্টা করে। গানের সুর আর চলে যাওয়া লঞ্চের তরঙ্গ একাকার হয়ে সুখলতার অঙ্গে অঙ্গে দোল খায়। আস্তে আস্তে বাতাসে মিলিয়ে যায় সে সুর। সুখলতা পরদিনের অপেক্ষায় থাকে।

সেদিন ফিরতি পথে সন্ধ্যারাতে মাঝনদীতে হঠাৎ ঝড় ওঠে। লঞ্চ পাক খেতে খেতে ডুবু ডুবু প্রায়। নদীর পানি অল্প থাকায় যাত্রীরা সবাই প্রাণ বাঁচানোর জন্য লাফিয়ে পড়ে। সাঁতরিয়ে তীরে উঠে। তীরের লোক ছুটি আসে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গ্রামের মানুষ দেখতে পায় না নদীতে আর কেউ আছে কিনা। মাঝনদীতে টর্চের আলো পৌঁছায় না। মোহন সাঁতার জানলেও দৃষ্টি না থাকায় জানে না তীরে

পৌঁছার দিক। নদীর আড় ভেবে লম্বালম্বিভাবে সাঁতার দেয়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে অবশ হয়ে আসে শরীর,সারারাত ধরে সাঁতরিয়ে তবুও কিনারায় পৌঁছতে পারে না।

একদিন যায় দুদিন যায় নদীতে লঞ্চ আর চলে না। সুখলতা কাপড়ের ঝুড়ি নিয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে নদীপানে। প্রতিদিনের কাজে তার মন বসে না। বাবার কাজে সাহায্য করে না। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলে না। নিবারণ ভাবে কন্যার শরীর খারাপ। তাই তাকে পানিতে গা না ভিজিয়ে ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলে। একাই সব কাপড় কাচে, ধুয়ে বাতাসে ছড়ায়।

ক'দিনপর আবার লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। সুখলতার তনুমন আনন্দে দুলে ওঠে। ভট্ট ভট্ট করে লঞ্চ এগিয়ে আসে। সুখলতা আর ঘরে পড়ে থাকতে পারে না। দুটো কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে যায় নদীপারে বাবার কাছে। টুংটুং ঘণ্টা বাজিয়ে লঞ্চ ফুকরা ঘাটের দিকে বাঁক নেয়। সুখলতা কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে লঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বিহ্বলা। সে আত্মগতা। একটি সুর শোনার জন্য অধীর। শ্রবণ ইন্দ্রিয় আরো সচেতন। কিন্তু লঞ্চটি আবার ঘণ্টা বাজিয়ে ঘাট ছেড়ে এবার উজানে চলে যাচ্ছে। কোথায় সে গান! কোথায় সে সুর! সুখলতা স্থির হয়ে যায়। চলে যাওয়া লঞ্চের ঢেউ কূলে এসে আছড়ে পড়ে। হাতের কাপড় নদীতে ভেসে যায়। সুখলতা প্রতিটি জল তরঙ্গের মাঝে সেই সুরকে খোঁজে।

জনক

অন্তরে পুঞ্জীভূত কষ্টের শতদল এক একটি করে পাপড়ি মেলছে। তারই শোভায় যেন নিজেকে সাজাচ্ছে সুস্মিতা। সংসারে ভালোমন্দের সংজ্ঞাকে ধাঁধার মতো লাগে তার। সর্বদাই যে মানুষটি তাকে না পাওয়ার আশংকায় শঙ্কিত থাকতো। তাই তাকে ভালোবাসার চাতুরীতে মন ভরিয়ে দিতে চাইতো। কিন্তু এখন? সময়ের ব্যবধানে- অর্থের আধিক্যে এখন সবই বিপরীত স্রোতে বইছে। অবলীলায় ভুলে যায় বিশেষ বিশেষ দিন তারিখগুলো। আসলে এখন তেমন আগ্রহও নেই। একসময় সুস্মিতার জন্মদিনে বিশাল ফুলের উপঢৌকনে ভরে যেত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের মেইন বিল্ডিংয়ে সুস্মিতার রুম। সাথে রুমমেটদেরসহ খাবারের জন্য দামি রেস্টুরেন্টের প্যাকেট। গ্রহণ না করে উপায় নেই কারণ ক্যাম্পাসে নেতার হাত হিসেবে সে পরিচিত। এমন কর্ম ছিল না যা সে পারতো না। ভয়ও পেত অনেকে। মিতা মানে সুস্মিতা। তখন আদর করে ও নামেই ডাকতো। তাকে না পেলে সে নাকি জীবন নষ্ট করে দিবে। মিতার মায়া লাগতো। ভীষণ। একটাই জীবন, সে জীবনে কাউকে যদি ভালো মানুষ করা যায়, সুখী করা যায় ক্ষতি কি? এমনই বোধের থেকে তাকে জীবনসঙ্গী করেছিল সুস্মিতা।

আর এখন সুস্মিতা মনে সান্ত্বনা টানে-পুরো বছরটাই যেখানে কাটে মান- সম্মানের দ্বন্দ্বে, রুচি আর ব্যক্তিত্বের টানপোড়েনে। সেখানে বছরের একটা দিন পেলেই বা কি তেমন পেতে পারে। তার তো আছে অনেক ভালো লাগা মানুষ- সময়- স্থান । এখানে ঘরের মানুষটা পুরোনো। জীবন ধারা আটপৌরে। নেই চোখ ঝলসানো সাজসজ্জা। তাই হয়ত প্রতিদিন মধ্যরজনীতে অবসন্ন ক্লান্ত দেহটাকে কোনোমতে বয়ে নিয়ে আসা। একটা ছাদের নিচে মাথা রেখে কোনোমতে রাত পার করা। তার বেশি কিছু না। সুস্মিতা ভেবে কূল পায় না কেনই বা হঠাৎ দৈবক্রমে আসে রাতের পর্বটুকু

ঢুকোতে। রুচিতে বাধে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধযুক্ত মুখের স্পর্শ। একপাক্ষিক সে পর্বগুলো কি না হলেই নয়। বহু আগে মরে যাওয়া তৃষ্ণা কেন জাগিয়ে তোলে। শুষ্ক মরুতে সবুজ শস্য ফলাবে এমন একসাগর শীতলজল কোথায়! কষ্ট হয় বৈকি! সে কষ্টগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করতে চায়। বিনিদ্র রজনী পার করা কি যে যন্ত্রণাদায়ক! আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে যায় পাশের রুমে সুস্মিতা। পত্রিকার পাতায় চোখ বুলায়। তখনই কানে ভাসে- তুই চলে আয় 'সু'। কি সব উদ্ভট চিন্তা। পত্রিকার পাতা দ্রুত উল্টিয়ে শেষ করেও কোনো আর্টিক্যালে মন বসাতে পারে না।

কোনো এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে বহুদিন পর দেখা সুস্মিতার সাথে তার। কানের দুধারে কেশ সাদাকালোয় মিশ্রিত হলেও চিনতে কারোরই অসুবিধে হয়নি। দেশের খ্যাতনামা ডা. কমল চৌধুরী। বিদেশ থেকে ফিরে ডাক্তারি পেশায় ও গবেষণায় নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও বিবাহের পিঁড়িতে বসা হয়নি।

বাবা মা গত হয়েছেন সেই বিদেশে থাকতেই। তেমন কেউ নেই যে তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবেন। আর এখন অন্য আত্মীয়রা সব কে কোথায়। সবাই যে যার মতো ব্যস্ত।

এখন এমনিভাবে মাঝে মাঝে আলাপ হয় তাদের। আলাপে উঠে আসে সুস্মিতার সংসার চিত্র। পরস্পরকে বড়ই নির্ভরশীল মনে হয়। সব কথা সহজেই প্রকাশ করা যায় যা আগে কখনো হয়নি।

'সু' কেন এত কষ্ট দিস নিজেকে? সে যে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আরে আসে আমার কাছে।' কথাগুলো সেদিন রেঁস্তোরায় খেতে খেতে বলেছিল কমল। 'জী এখন কি আর সম্ভব?' ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল সুস্মিতা। সবই সম্ভব। 'সবকিছুই অপেক্ষা করছে আগেরই মতো।'

তাতো আগে বুঝিনি। ভেবেছিলাম বিদেশ থেকে ডাক্তারি ডিগ্রির সাথে বিদেশীনিও নিয়ে এসে আমাদের মেমভাবী উপহার দেবে।

আমিও বুঝিনি এরই মধ্যে কাকা তোর বিয়ে দিয়ে দিবেন। আর আমার এখানে থেমে থাকবে একটি অপেক্ষার সকাল, উদাস দুপুর, বিষণ্ন বিকেল, একাকী রাত। সব তোরই জন্য।

... আমাকে দিশেহারা করো না। বিয়ে করে সংসারী হও।

মেয়েলি কথা ছাড়। মনে আছে ছোটবেলায় দাদা বাড়িতে সেই বৈশাখ মাসে আম পাড়তে গিয়ে লাঠিটা ছুটে তোর মাথার উপর পড়েছিল?

সে জন্য তো দাদী তোমাকে কষে থাপ্পড়ও মেরেছিল।

খুব ব্যথা পেয়ে কেঁদেছিলি। সারাদিনে বাড়ি আসিনি ভয়ে।

সন্ধ্যায় চুপিচুপি বাড়ি এসেছিলাম।

তোর কপাল কেটে রক্ত ঝরা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম ভীষণ।

দাগটা এখনো আমার কপালে জ্বলজ্বল করছে।

আর তুই! ধ্রুবতারা হয়ে জীবনাকাশে এখনো জ্বলছিস।

সুস্মিতার জীবনে রূদ্ধ দরজায় যেন প্রথম প্রভাত এসে কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে বাহিরে এসে সে প্রভাত ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। অবাক বিস্ময়ে ভাবে অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা জীবন এত আলোয় ভরে উঠতে পারে!

মধ্যরাতে দরজা খুলতে দেরী হওয়ায় হাতের মোবাইল ছুঁড়ে মারে বদ্ধ মাতাল স্বামী। রক্তঝরা কপালে পরদিন সুস্মিতা ডা. কমলের চেম্বারে গেল। ব্যান্ডেজ লাগিয়ে মুখটা দুহাতে তুলে জিজ্ঞেস করলো 'বঞ্চিত জীবনের ঘানি আর কত টেনে যাবি 'সু'। নতুন করে জীবন শুরু কর'। হু হু করে কেঁদে ওঠে তার বুকে মুখ রাখে। কমল জড়িয়ে ধরলো। সোহাগের পরশ বুলায়। সে স্পর্শ শিরায় শিরায় আন্দোলিত।

আজকাল সকালে ঘুম থেকে উঠলেই শরীরটা বেশি খারাপ লাগে। ডা. জানালো এতে চিন্তার কিছু নেই। এমনই হয় প্রথম অবস্থায়। শরীরে দ্বিগুণ খাবারের প্রয়োজন। আস্তে আস্তে শরীর ভারী হয়ে উঠে। জীবের অস্তিত্ব, নড়াচড়া অনাগত সন্তানের ভাবনায় বিভোর থাকে সুস্মিতা। সন্তানের নাম হবে 'উল্লাস'। কমল দেখে সুস্মিতার দুচোখ মাতৃত্বের স্বপ্নের ছায়া। সুখ সুখ গন্ধ ওর চারপাশে। সেদিন রাতে মদ্যপাবস্থায় ভীষণ চেঁচামেচি অকথ্য গালিগালাজ ফোনে কার সাথে যেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। অসুস্থ সুস্মিতা উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে-কি হয়েছে?

লোকটি ওমনি পদাঘাতে মেঝেতে ফেলে দেয়। অজ্ঞানাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদ পেয়ে ডা. কমল সেখানে ছুটে যায়। অস্ত্রোপচার হয়। সন্তানকে বাঁচানো গেলেও সুস্মিতা আর চোখ মেলেনি। অপারেশন থিয়েটারে দুহাতে তুলে নেয় কমল শিশুটিকে। বড় মায়াবী মুখখানা। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গভীর ভাবে পরখ করতে থাকে। শিশুটির চোখ-নাক-কান-ঠোঁট চেনা চেনা লাগে। এক সময় পিট্ পিট্ করে চোখ দুটো মেলে তাকায় তার দিকে। গহীন অন্তরে মোচড় দিয়ে ওঠে। মায়ের শাল দুধ বঞ্চিত শিশুটি প্রথম পিপাসায় কাঁদে। সে কান্নায় ডা. কমলের দুচোখকে সিক্ত করে। নার্স এসে নিয়ে যায়।

যদিও হাসপাতালে একসাথে লাশ ও শিশু পুত্রকে গ্রহণ করতে এসেছিল সে লোকটি। তবে স্ত্রী বিয়োগে লোকটির তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। পাশ থেকে জানালায় দাঁড়িয়ে ডা. কমল দেখলো শিশুটিকে তার দাদির হাতে তুলে দিচ্ছে নার্স। সুস্মিতার বাবা মা মারা গেছে বহু আগে। নিকট আত্মীয় তেমন কেউ নেই যে শিশুটির সংবাদ নিতে পারে। কমল হৃদয়ে কোথায় গভীর টান বোধ করে। বুকটা শূন্য শূন্য লাগে। একাকী ঘরে ছোট্ট চোখ দুটো প্রদীপ হয়ে জ্বলে। এপাশ ওপাশ করে ঘুম আসে না। ওই এতটুকু মুখ কি বিরাট স্থান দখল করে নিয়েছে। ইচ্ছে হয় তাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। একটু আদর করতে। একদিন সকল দ্বিধা জড়তা কাটিয়ে শিশুটির খোঁজে ফোন করে সুস্মিতার বাসায়। কাজের ছেলে আবুল কালাম ফোন ধরে। তার কাছেই সব সংবাদ নেয়। জানতে পারে সাহেব- বেগমসাহেব কেউ বাসায় নেই।

বেগম সাহেব!

'হ্যাঁ। আমাদের সাহেব আবার বিবাহ করেছেন। অফিসের সিমকি ম্যাডামকে। ম্যাডাম এখন আর অফিসে যান না।' কমল ভিতরে ভিতরে চমকে উঠে 'উল্লাস' এখন সৎমায়ের দখলে!

বাচ্চার দেখাশুনা কে করে?

দাদি আম্মা আছে আর আমি আছি

তোমার দাদি আম্মা কোথায়?

বুড়া মানুষ ঘুমায় পড়ছে।

এমন সময় শিশুটি কেঁদে ওঠে। ফোনে শুনতে পায়। আবুল কালাম বলে 'রাখি বাবু উঠছে।' কমল ভাবে শিশুটির চিন্তায় সুস্মিতার আত্মা জানি কতই কষ্ট পাচ্ছে। সে নিজে কিছু করতে পারছে না। কাকা কাকী বেঁচে থাকলে হয়তো এমন হতো না। এখন তো কমল সম্পূর্ণ বাইরের মানুষ। ওদের পরিবেশও ভিন্ন। আবুল কালাম বাইরে দোকানে এলে কমল তার সাথে ধীরে ধীরে আলাপ করে। তাকে হাত করে নেয়। মাঝে মাঝে টাকা দেয়, বিনিময়ে যেন শিশুটির সেবা-যত্ন ভালো মতো করে। আবুল কালাম বুঝে উঠে না কেন লোকে খামোখা এত টাকা ব্যয় করে। তবুও নগদ টাকা পেয়ে সেও তৃপ্ত। দোকানে এটা সেটা কিনে খাওয়া যায়। শর্ত একটাই, বাসায় কেউ যেন না জানে এ ব্যাপারটা।

ব্যথায় তখন কি যে হয়েছে কমলের শুধুই উল্লাসের কথা মনে আসে। কাজের মধ্যে থাকলেও বার বার মনে পড়ে। এত কাজ এত টাকা তা কার জন্য? এক সময় মনে হতো 'সু' টাকার পাহাড়ে বসে সুখের ঐশ্বর্যে ডুবে আছে। তখন নিজেকে আরো ব্যস্ত রাখতো কাজে। কিন্তু এখন পেয়ে হারানোর ব্যথায় বেশি কাতর থাকে। সকাল থেকে আজ কোনো কাজে মন বসাতে পারেনি ডা. কমল। যখন তখন ফোনও করা যায় না ওই বাসায়। দুপুরে বিউটি পার্লার কালচারে অভ্যস্ত সিমকি গিয়েছে সেখানে। দাদি বাথরুমে গোসলে ব্যস্ত। এমন সময় সে ফোন করে। শিশুটির কান্না আবুল কালাম থামাতে পারছে না। কমল ফোনটা বাচ্চাটার কানে ধরতে বলে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ডাকে-'বাবা বাবা কি হয়েছে। সোনা মানিক আমার!'

গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে আস্তে আস্তে কান্না থামিয়ে দেয়। বাচ্চাটি বড় বড় চোখ মেলে এদিক সেদিক তাকায়। শিশুটি সে জাদুকরি কণ্ঠকে খুঁজে। ফোনটা সরিয়ে নিলে আবার কেঁদে উঠে। আবুল কালাম আবার ফোনটা কানে ধরে। কমল জিহ্বায় একরকম আহ্লাদের শব্দ করলে ফিক্ করে হেসে উঠে শিশুটি। সে হাসির শব্দ কমলের কর্ণ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ডে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দোল খেতে শুরু করে। চলমান সেই দোল ধমনিতে প্রবাহিত। উদ্বেল করে তোলে তাকে। অদেখা এক টুকরো হাসি আচ্ছন্ন করে রাখে। কেবলই শুনতে ইচ্ছে করে। কেবলি ইচ্ছে করে ওর পাশাপাশি থাকতে।

একদিন সুস্মিতাকে জিজ্ঞাস করেছিল 'বাচ্চাটি বড় হয়ে আমাকে কি বলে ডাকবে?' -তুমি যেটা শুনতে চাও।'

শিশুটি একটু একটু করে বড় হচ্ছে। বসতে পারে। মুখে কি সব অদ্ভুত শব্দ আওড়ায়। ফোনে তা শুনতেও ভালো লাগে। আস্তে আস্তে সে 'বু-বু' করে মুখের ফেনা তুলতে তুলতে একদিন 'বা-বা' বলতে শুরু করে। সেদিন আকাশছোঁয়া আনন্দ কমল রাখে কোনখানে। বিকালে শিশুপার্কের এক রেস্টুরেন্ট-এর সামনে গিয়ে বসে। কফির অর্ডার দেয় আর শিশুদের খেলাধুলা দেখে। সব শিশুকেই মনেহয় তার উল্লাসের

মতো। বাবা-মার হাত ধরে শিশুরা বিভিন্ন রাইড-এ উঠে আনন্দে চিৎকার করে। কমলের ইচ্ছা জাগে একদিন সেও উল্লাসকে নিয়ে এমনি করে সময় কাটাবে এখানে।

সিমকির সাথে শাশুড়ির মিল ঘটছে না। সে কিছুতেই চায় না শাশুড়ি এ বাড়িতে থাকুক। বন্ধু-বান্ধব বাসায় এনে আনন্দ স্ফুর্তি করবে। এমনটাতে কোথায় যেন বাধো বাধো লাগে শাশুড়ি থাকলে। বাচ্চাটিও বড় হচ্ছে। সে এখন স্কুলে যায়। সিমকি একদিন বলেই বসে 'এখন এমন দরকার কি? উল্লাস স্কুলেই থাকে দিনের বেশি সময়। রাতে ঘুম। বাকী সময়ের জন্য আবুল কালামই যথেষ্ট।'

বৃদ্ধা গ্রাম্য হলেও কথার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ভুল করে না। দুচোখ জলে ভরে উঠে। সিমকির কথার সুর ধরে ছেলেকে বলে বাড়ি যাবার কথা। ছেলে একটু আপত্তি করলে বলে 'তোর বাবার কবর দেখি না বহুদিন। ওখানেই বাকিটা সময় কাটাতে মন চায়।' অমনি সিমকি সায় দেয়-'বুড়া মানুষের সেন্টিমেন্ট তুমি বুঝবে না। এ নিয়ে জোরাজুরি করো না। উনাকে এ বয়সে নিজের মতো করে সুখে থাকতে দাও। অনেক তো করলেন আমাদের জন্য।'

নতুন স্ত্রীর কথার চাতুরি কিছু না বুঝেই ছেলে অনুমতি দেয় মাকে গ্রামের বাড়ি যাবার। শাশুড়ি চলে যায়। শুধু কচি বাচ্চাটার চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত থাকে বৃদ্ধার। এতদিনে বাড়িটা পুরোপুরি সিমকির দখলে এল। বাইরে যাতায়াত যখন তখন। বাড়িতে আড্ডা হৈ চৈ ইচ্ছে মতো। মেহমান এলে উল্লাসের রুম থেকে বের হওয়া নিষেধ। মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত অতিথি সেবা চলে। উল্লাস না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে তার রুমে। স্কুলে যায় ড্রাইভারের সাথে। আবুল কালামের কাছ থেকে স্কুলের ঠিকানা যোগাড় করে কমল । উল্লাসকে একটু দেখবে। সে কত বড় হলো!

উল্লাস প্রত্যহ স্কুলে বকা খায়, পড়া পারে না। কাপড় ইস্ত্রি করা থাকে না, নখ-চুল কাটা থাকে না। স্কুলে শাস্তি পাওয়া লজ্জাজনক এটা সে বুঝে। বাড়িতে বলবেই বা কার কাছে। তার মায়ের রুমের মালিক সিমকি। সেখানে উল্লাসের প্রবেশ নিষেধ। দুপুরে সে চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ড্রেসিংরুমে টেবিল থেকে নেলকাটারটা আনতে যায় নিজের নখ কাটার জন্য। হাতের ধাক্কায় পারফিউম-এর বোতল পড়ে ভেঙ্গে যায়। সিমকি ছুটে আসে। 'ব্যাটা, চুন্নির বাচ্চা।' বলেই কান ধরে থাপ্পড় লাগায়। উল্লাস কাঁদতে কাঁদতে রুমে চলে যায়।

কমল মাঝেমাঝে আবুল কালামের কাছে গোপনে কিছু খেলনা, কখনো কিছু খাবার কিনে দেয় দোকান থেকে। সিমকির কাছে ধরা পড়লে সে বলে নিজের

জমানো টাকা থেকে কিনেছে উল্লাসের জন্য। বিশ্বাস হয় না সিমকির-'নিশ্চয়ই বাজারের টাকা চুরি করেছিস।' তাই দোকানে যাওয়া বন্ধ আবুল কালামের। সে দায়িত্ব পেয়েছে ড্রাইভার। স্কুল ছুটির সময় কমল দূর থেকে উল্লাসকে দেখে। কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। কাঁধে ব্যাগ হাতে পানির ফ্লাস্ক নিয়ে উল্লাস গাড়িতে উঠতে দেরী করলে ড্রাইভার ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে ঢুকিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয়। এমন দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে কমল এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারকে বলে- 'বাচ্চাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে নেই।'

২

ড্রাইভার তেড়ে আসে '-আপনি কে আমাকে শিক্ষা দেবার? বাড়ি যান নিজের বাচ্চারে দেখেন । অন্যের পোলার উপর দরদ দেখাতে হবে না।'

অপমানিত কমল নীরবে সরে যায় আত্মসম্মান বাঁচাতে। কমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে উল্লাস। গাড়ি চলে যায়। আবুল কালাম ফোনে কেঁদে জানায়, তার চাকরি চলে গেছে চুরির অপরাধে আর উল্লাসের প্রতি অতিরিক্ত আদিখ্যেতার কারণে।

এরপর থেকে উল্লাসের খবর ফোনে নেওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। স্কুলগেটে দাঁড়িয়ে দূর থেকে উল্লাসকে দেখে। কোনো কোনো দিন ড্রাইভারের চোখাচোখি হলে ড্রাইভার কেমন কটমট করে তাকায়। স্কুল ফাইনাল ও উইন্টার ভ্যাকেশনের বন্ধ হয়ে যাবে দু মাসের জন্য। বন্ধের আগের দিন স্কুল কর্তৃপক্ষ সব বাচ্চাদের শিশুপার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ডা. কমলও সেদিন শিশু পার্কে যায়। কোনো এক সুযোগে উল্লাসকে ডেকে কাছে আনে। কোলে তুলে নিয়ে যায় কর্নারের একটি রেস্টুরেন্টে। ওর পছন্দের সব খাবারের অর্ডার দিয়ে টেবিল ভরে দেয়। উল্লাস মনের আনন্দে খেতে থাকে।

এদিকে টিচাররা উল্লাসকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এক সময় দূর থেকে দেখতে পেল ওদের। সন্দেহ সবার চোখে মুখে। এগিয়ে এলেন সকলে। সন্দেহজনক লোক ভেবে নানা প্রশ্ন কমলকে। 'এ ছেলেটি কে? আপনার কি হয়? কেন না বলে এখানে এনেছেন? কি খাওয়াচ্ছেন? কার অনুমতি নিয়ে?' কমল সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। উল্লাসকে প্রশ্ন করে- 'কে লোকটি? তুমি কি চিনো?' উল্লাস কিছুই বলতে পারে না। সন্দেহ ঘনিভূত নিশ্চয়ই ছেলেধরা। কাছেই শাহবাগ পুলিশ ফাঁড়িতে তুলে দেবার আগে ইচ্ছেমতো উত্তম-মধ্যম দিতে প্রস্তুত সবাই। উত্তেজিত সকলেই। কমলের নিজের পরিচয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। তার আগেই শুরু হয়। 'ব্যাটা কিডন্যাপার।' অবস্থা বেগতিক। কমল ইতস্তত করে অস্ফুট স্বরে বলে-আ-আ-মি আ-মি---।

কণ্ঠস্বরটা উল্লাসকে বিচলিত করে তোলে। চেনা চেনা। অতি পরিচিত। কোথায় যেন শুনেছে সে। হঠাৎ টেলিফোনে শোনা সে কণ্ঠস্বর আর চোখের সামনে দেখা মানুষটির মধ্যে কোথায় যেন মিল খুঁজে পায় উল্লাস। সাথে সাথেই কমলকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস চিৎকার করে বলে

'ইনিই আমার বাবা।'

মুক্ত পৃথিবীর পানে

আকাশের শরীর থেকে আঁধার পুরোপুরি নামেনি তখনো। রাত পোহালো মাত্র। রাস্তার নির্জনতা ভেদ করে গোয়ালন্দ বাজারে লোক চলাচল শুরু হয়নি এখনো। খচখচ্ শব্দে মর্জিনার ঘরের কপাট খোলার আওয়াজ। গায়ে শার্ট জড়িয়ে নেয় ফটু মিস্ত্রি। ফটু মিস্ত্রির বউ অপেক্ষায় থেকে থেকে অবশেষে মাঝরাতে ভাতের হাঁড়িতে পানি দিয়ে রেখেছে। বউয়ের কাছে একগাদা মিথ্যার পসরা সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বলবে কাল সারারাত ধরে আটার কলে কাজ করতে হয়েছে অথবা পথে যেতে যেতে অন্য কোনো নতুন সমস্যা তৈরি করে নিবে। গ্রাম্য সরলা বউয়ের বিশ্বাস তো হবেই আর না হলেই বা কি। অত তোয়াক্কা ফটু মিস্ত্রি করে না। একেবারে লাঠিপেটা করে গরিব বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ভয়তো তার বউয়ের আছে । মর্জিনা মাচান থেকে গামছা টেনে নেয়। পাশের পদ্মায় নাইতে যাবে। ফটু মিস্ত্রি বুক পকেট থেকে কিছু টাকা মর্জিনার হাতে দেয়।

এত কম দিলা যে মিস্ত্রি!

কম কীসের? এ-ই তোর জন্য বেশি। এহন কি আর তোর গতরের দাম আছে? কদ্দিন পর তো মশা মাছিও তোর গতর ছুঁইবো না। কইলাম তোর মাইয়াডারে কামে লাগাইয়া দে। কেমন লাউয়ের ডগার লাহান শরীরডা তরাইয়া উঠতাছে!

'খবরদার। আমার মাইয়ার নাম মুখেও আনবা না। তারে লেখাপড়া শিখাইয়া চাকরিতে দিমু।' মর্জিনা জ্বলে ওঠে।

'চাকরি! বেশ্যার মাইয়ারে কেডা দিবো চাকরি? আরে চাকরি যেখানে হইবো সেখানে কি পুরুষ মানুষ নাই? খাবলাইয়া খাবলাইয়া খাইবো। তা আবার মাগনা মাগনা। আহারে আমার লাউয়ের ডগা। বুঝলিনা রে মর্জিনা।'

বেড়ায় ঝোলানো আয়নায় তাকিয়ে মাথার চুল হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বাড়ির পথে রওনা দেয়।

মর্জিনা মাচান থেকে একটি কাপড় কাঁধে নিয়ে ধীরে ঘর থেকে বের হয়। ভাবতে থাকে আমার মাইয়া না হয় বেশ্যার মাইয়া, কিন্তু আমি? আমিতো বেশ্যার মাইয়া আছিলাম না। আমার দশা এমন হইলো কেন? কীভাবে মাজেদা খাতুন থেকে আজ মর্জিনা? মনে পড়ে বাবা বক্কর আলী ছিল এই পদ্মার জেলেমাঝি। সেই জেলে পাড়ায় ছিল তাদের বসতি। ছিল মা-বাবা-ভাই ও বোন।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় মর্জিনা। বাজারের চৌরাস্তার ধারে সকাল বেলায় কিছু লোকের সমাগম। সাধারণত ও পথ মাড়ায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে তার চলাচল। কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করতে না পেরে আজ এগিয়ে যায়। পুষ্পমাল্য অর্পণ করতে এসেছে বর্তমান চেয়ারম্যান। তার স্থাপিত স্বাধীনতা স্মৃতিফলকে। তিনি আগামী নির্বাচনে এমপি প্রার্থী। মাইকে মাইকে মুখরিত শ্লোগান। এসব দিবসের কি রং বা কি স্বাদ তা মর্জিনার জানা নেই। সে জানে গরম ভাতের গন্ধে কেমনে মনটা ভরে যায় আর পান্তা ভাতের মাদকতায় কেমন ঘুম ঘুম নেশা চক্ষে নেমে আসে। আরো একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মর্জিনা। কেমন সুন্দর বসন শুভ্রকেশ শরীরের সুবাস নাকে এসে পৌঁছে। একদম নুরানী চেহারা। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। একেবারে ফেরেস্তার লাহান মনে হয়। চোখাচোখি হয় মর্জিনার সাথে। একবার দুবার বেশ কয়েক বার। সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে পাড়ি দেয় পিছনের চৌত্রিশ বছর। হ্যাঁ, লোকটাকে সে চিনে। হয়ত লোকটিও মর্জিনাকে চিনেছে। নইলে কেন বার বার তাকাচ্ছিল। শিউরে ওঠে মর্জিনা। তখন যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। মর্জিনার বাবা বক্কর মাঝির ছিল পদ্মার বুকে অবাধ চলাচল। মাছের নৌকার নিচে গোলুইয়ের ভিতর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র গোপনে বহন করতো।

একবার দুই খানসেনাকে নৌকায় পার করতে গিয়ে ইচ্ছে করে মাঝ গাঙে নৌকা ডুবিয়ে মারে। আর সে ঘটনায় তাকে প্রাণ দিতে হলো আলবদর নেতা সোমেদ আলীর হাতে। সীমাহীন অত্যাচার নেমে আসে বাড়িঘর ও পরিবারের উপর। কিশোরী মাজেদাকে সোমেদ আলী নিজে তুলে নিয়ে যায়। তারপর কত ঘটনা। কত হাত বদল। ফিরে পায়নি মর্জিনা তার পরিবার-গ্রাম এমনকি সমাজ। সে এখন নিষিদ্ধ পল্লীবাসী।

স্বপ্ন শুধু একমাত্র কন্যা ঝর্নাকে নিয়ে। সন্তানকে বাঘিনীর মতো বুকের তলে আগলে রেখেছে,যতসব বুভুক্ষু রাক্ষস শ্বাপদের ছোবল থেকে। মায়ের একান্ত চেষ্টা যেমন করে হোক মেয়েকে সরিয়ে ফেলতে হবে এ অন্ধকার অবরুদ্ধ নিষিদ্ধপল্লী থেকে। তা না হলে তাকেও মায়ের মতো সারাজীবন এই অন্ধকারেই পচতে হবে। একবার এ জগতে নাম উঠলে শত চেষ্টায় সে বদনাম ঘুচাতে পারবে না। বিনিময়ে পাবে লোকের ধিক্কার আর গঞ্জনা। কেউ জানবে না বা জানতে চাইবেও না কেন কীভাবে একটি নারী এ জগতে আসে। তাই তো মর্জিনার ইচ্ছে যেমন করে হোক মুক্ত পৃথিবীর আলো মেয়েকে দেখাতেই হবে। যে পৃথিবীর আলো জন্মের পর সে তার সন্তানকে দেখাতে পারে নি।

রিসার্চের কাজে পতিতালয়ে এসেছিল কিছু এনজিও কর্মী। তাদের হাতে তুলে দিয়েছে ঝর্নাকে। মুক্ত পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নিজের পায়ে হাঁটতে। লেখাপড়া শিখে সামাজিক স্বীকৃতি পায় ও সমাজে ভালো কাজ করার সুযোগ যেন পায় শুধু এতটুকু আশায়। যদিও এ পল্লীমাসীর আপত্তি ছিল ঝর্নাকে নিয়ে। এজন্য কম কটু কথা শুনতে হয়নি মর্জিনাকে মাসীর কাছে। কিন্তু মর্জিনা ছিল সিদ্ধান্তে অনড়। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে যা রোজগার হয়, তাতে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে। খদ্দেররা সব নতুন কচি শরীর খুঁজে। পাড়ার মাসীই সবার রেট নির্ধারণ করে দেয়। এমন একসময় ছিল তাদের পাহারা দিয়ে রাখতো। আর এখন এখান থেকে মর্জিনা চলে গেলেও মাসীর আপত্তি থাকবে না।

'সর সর' এই অপবিত্র মাইয়া মানুষ এইখানে কেন?' চেয়ারম্যানের লোকজনের ধমকে সম্বিত হয় মর্জিনার। ধীরে চলে আসে পদ্মার কাছে। যে নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায় তার সোনালি অতীত, শৈশব ও কিশোরী দিন। ডুব দিয়ে সকল পাপ সকল কলংক ধুয়ে ফেলতে চায়। ইচ্ছে হয় ডুবটা মাঝগাঙে গিয়ে দিতে। ইচ্ছে হয় শীতল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে। কদিন পর তো চলে যেতে হবে তবে সে চলে যাওয়ায়ও শান্তি নেই। আছে ধিক্কার, ঘৃণা, অবহেলা। জানাজাও হবে না। নষ্ট শরীরটাকে মাটি চাপা দিতেও কত কথা উঠবে। মমিন বান্দারা আপত্তি জানাবে। মাটিও মিলবে কিনা তা জানা নেই। তার চেয়ে শীতল জলে হারিয়ে গেলে মন্দ কি?

সাঁতরিয়ে মাঝগাঙের দিকে ডুব দেয়,আরো ডুব। চুলের খোঁপাটা ময়ূরের মতো পেখম মেললো। শাড়িটা যেন ভাঁজে ভাঁজে পালের মতো খুলে গেল। অবসন্ন শরীরটাও তলিয়ে আসছে। তাহলে কি এভাবে বিদায় নিবে পৃথিবী থেকে? কিন্তু তাকে যে জানতে হবে চেয়ারম্যান সোমেদ আলীর কাছে মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিফলকে ফুল দিতে এসে বক্কর মাঝির মুখখানা মনে পড়েছিল কিনা? এদিকে শাড়িতে পা জড়িয়ে আসছে। সত্যিই তো কূলে আর ফেরা যাচ্ছে না। হঠাৎ ঢেউয়ে বাতাসে মিশে একটি মিহি স্বর কানে এসে পৌঁছে --- মা, মা আ-আ-আ হ্যাঁ এতো ঝর্নারই কণ্ঠ। মুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলে যায় অন্তরে। কোথা থেকে যেন জীবনচালিকা শক্তি ফিরে আসছে। অনুভব করে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে নাড়ির গতি। যাবে সে পৌঁছে তীরে।

মাকে জড়িয়ে ঝর্না বলে, 'এখন আমি ভালো আছি মা, তোমার ইচ্ছা মতো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আপারা লেখাপড়া শিখাইছে। গার্মেন্টস কারখানায় কাজ নিছি। কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে দু'বেলা দুমুঠো খেতে পাই তাতে অনেক শান্তি মা। তোমার অন্ধকার জীবনের কথা ভাবলে এখন আঁতকে উঠি মাগো। আমি মাস শেষে বেতনের যে ক'টা টাকা পাবো তা দিয়ে তোমার আমার ভালোমতো চলে যাবে। তুমি মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে শুনে তারা তোমার পুনর্বাসনের আগ্রহ দেখাইছে। এনজিও আপারা আমারে সহজ কিস্তিতে একটা সেলাই মেশিন দিছে। তুমি ঘরে বসে রাতে মেশিনে বাচ্চাদের জামা-কাপড় সেলাইবা-আর দিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করবা। আমি তোমারে নিতে আসছি মা। তুমি চল আমার সাথে। দেখবে পৃথিবীটা এখনো কত সুন্দর'!

নীলাকাশে নীলাদ্রী

প্রায় মধ্যরাত তখন। সাধারণত ইন্দ্রনীল উইক এন্ড নাইটগুলো মস্কোর নির্দিষ্ট এক অভিজাত ক্লাবেই কাটায় কিন্তু আজ বন্ধের দিন হলেও কেন জানি ওর মন ভালো নেই। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ক্লাব হতে বের হয়ে ড্রাইভ করে সোজা বাসায়। লিফটে সুউচ্চ টাওয়ারে। নবম তলায় উঠে পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুললো। টলমলে শরীরে জুতাসহই বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ঘরের স্নিগ্ধ আলোয় একটা শুভ্র বিছানায় শুয়ে আছে নীলাদ্রী। ইন্দ্রনীলকে দেখামাত্র হাত ঈশারায় ডাকলো। ইন্দ্রনীল ধীরে কাছে গেল। নীলাদ্রী ক্ষীণ কণ্ঠে বললো 'নীল তোমার হাত দিয়ে আমার মাথাটা ছুঁয়ে দাও, কতদিন তোমাকে দেখি না।' সত্যিই তো! অনেক দিন পর আজ নীলাদ্রীর সাথে দেখা হলো।

ইন্দ্রনীল মাথায় হাত দিতেই দেখে কেউ নেই।

এখন সকাল। গতরাতের রঙিন পানির নেশাগ্রস্ত নয়। সে এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু গতরাতের স্মৃতিটুকু তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঐ একখানি মুখ তাকে শুধু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ চোখজোড়া তাকে পাহারা দিচ্ছে। অথচ কতদিন চেষ্টা করেছে তার মায়াবী মুখখানা একবার দেখতে পারেনি। নীলাদ্রী, ইন্দ্রনীলের অভিমানী অদ্রী। স্বপ্নেও তার কাছে আসে নাই আর। আজ তার অদ্রী তাকে ডেকেছে। তার স্পর্শ পেতে চেয়েছে।

ইন্দ্রনীল সাথে সাথেই বাসা থেকে বের হলো। অফিসে গিয়ে ছুটির ব্যবস্থা করলো। সে যেন এতদিন অদ্রীর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিল। আর দেরী করা নয়। সাথে সাথেই রিটার্ন টিকেট কনফার্ম করে এল। কিন্তু এতদিন পর সে অদ্রীর কাছে যাবে, তাও কি খালি হাতে? একটা ফুলের দোকানে গেল। দোকানীকে বললো অন্তত কয়েকদিন যেন তাজা থাকে এমনভাবে যেন প্যাকেট করে। ফুল ও তোড়ার ডিজাইন ক্যাটালগ দেখে ইন্দ্রনীল পছন্দ করে দিল।

পরদিন রওনা হবার পথে দোকান থেকে তুলে নিল চমৎকার সাজানো বিদেশি ফুলের বিশাল এক ঝাড়। ফুলগুলো বিদেশী হলে কি হবে, রংগুলো অদ্রীর পছন্দের। তারই প্রিয় রঙের ফুল সাদা।

নীলাকাশে প্লেন উড়ছে। সিটে হেলান দিয়ে ইন্দ্রনীল ভাবছে তার অভিমানী অদ্রী এতদিন পর তাকে ডেকেছে, দেখতে চেয়েছে - কীভাবে আর সে একা বিদেশে থাকতে পারে? ইন্দ্রনীলের রাগ অদ্রীর উপর নয়, ছিল তার বাবার উপর। কে অদ্রীকে যেতে দিল না ইন্দ্রনীলের কাছে সে সময়। তাহলে এমনটি হয়ত হতো না। সেই রাগে ও দুঃখে আর আসেনি দেশে।

ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হলেও বংশ অহমিকা ছিল না কখনো ইন্দ্রনীলের। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির এক বন্ধে বন্ধুকে সাথে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল নিজগ্রাম মোহনপুরে। গ্রামে নীলদের বিশাল আকৃতির বাড়ি। সেখানে গুটিকয়েক চাকর-বাকর ছাড়া পরিবারের আর কেউ থাকে না। মনিবপুত্রকে পেয়ে তাদের ব্যস্ততার সীমা নেই। পুকুরের মাছ, গাছের ফল নিয়ে আপ্যায়নের মহাসমারোহ।

শারদীয় পূর্ণিমাতে তাদের মোহনপুর গ্রামে বাউল আসর বসে। স্বনামধন্য বৈদ্যনাথ বাউলের বাড়িতে একটানা তিনদিন চলে সে আসর। ইন্দ্রনীল গেল বন্ধুকে নিয়ে বাউল বাড়িতে। ব্রাহ্মণ জমিদারের পুত্রকে তার আসরে দেখে খুব খুশি হয়। তাকে বসতে দিবে কোথায় দরিদ্র বাউল। পারলে মাথায় তুলে রাখে, কিন্তু ইন্দ্রনীল ঘরের দাওয়ায় বিছানো চটের উপর সবার সাথে বন্ধুকে নিয়ে বসলো। সন্ধ্যারাতে শারদীয় আকাশের চন্দ্রালোক বাউল বাড়ির প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়লো। শুরু হলো আসর। একটার পর একটা বাউল সংগীত হচ্ছে মুগ্ধ হয়ে তারা শুনছে। বাউল সাধক বৈদ্যনাথের মোহনীয় কণ্ঠের সাথে মাঝে মাঝে যোগ দেয় তার কন্যা নীলাদ্রী। ইন্দ্রনীল অভিভূত এক মুগ্ধ শ্রোতা। বাউলকন্যা নীলাদ্রী পরিবেশন করে কিছু ফলাহার। বন্ধুকে নিয়ে ইন্দ্রনীল খেল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে নীলাদ্রীকে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো এক হেমাঙ্গিনী। তার সৌম্য-কান্তিরূপ ইন্দ্রনীলের হৃদয়াকাশে ঝড় তুললো। সে যেন বাঁধা পড়লো।

এরপর থেকে একটু ছুটি পেলেই কারণে অকারণে ইন্দ্রনীল ছুটে আসে গ্রামের বাড়িতে। বাবা-মাও অবাক ছেলের হঠাৎ গ্রামপ্রীতি দেখে। মনেমনে খুশি হলো বৈকি। কিন্তু যখন জানতে পেলেন গ্রামের এক বাউল কন্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইছে তাদের পুত্র তখন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'প্রয়োজনে ত্যাজ্য করবেন, তবে ব্রাহ্মণপুত্রের সাথে বাউল সম্প্রদায়ের বিয়ে কখনো সম্ভব নয়।'

তা-ই হলো। পরিবারের সম্পর্ক ছেদ করে নীলাদ্রীকেই বিয়ে করলো ইন্দ্রনীল। বিয়ের পর কিছুদিন বাউলের বাড়িতেই থাকতো। কিছুদিন পর স্কলারশিপ নিয়ে রাশিয়ায় চলে গেল ইন্দ্রনীল । কথা ছিল সব ঠিকঠাক করে পরে এসে অদ্রীকে নিয়ে যাবে।

নাহ্, আর ভাবতে পারছে না ইন্দ্রনীল। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। বিমানের সুন্দরী আধুনিকা এয়ারহোস্টেজ খাবার নিয়ে এল। কিছু খাবার তুলে নিল। ভাবছে কোনো একদিন মোহনপুর গ্রামে বাউলের জীর্ণ কুটীরে, অদ্রী রান্না করে, দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করতো। মাঝে মাঝে তালের পাখা দিয়ে বাতাস দিতো। ইন্দ্রনীল নিষেধ করলেও সে শুনতো না। কি মধুর সেদিন। অথচ কত ক্ষণস্থায়ী।

এদিকে ইন্দ্রনীল বাউলকন্যার পাণিগ্রহণ ও তার হাতে অন্ন গ্রহণ করে শুধু জাতই খুইয়েছে তা নয়। মৃত্যুর পর যেন বাবা- মার মুখদর্শনও না করে, এই ছিল পুত্রের প্রতি বাবা-মার শেষ নির্দেশ।

সবই ভাগ্যের খেলা। সবক'টা ঘটনা কি দ্রুত ঘটে গেল। তাঁরাও চলে গেলেন ওপারে।

ইন্দ্রনীলের নিজের আসতে একটু অসুবিধা। তাই বন্ধুর মাধ্যমে বৌয়ের মস্কো আসার সব কাগজপত্র ঠিক করে পাঠালো। এদিকে অদ্রী অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তার বাবা তাকে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালো।

এসময় ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত তাছাড়া বিদেশে অন্যান্য সুযোগ- সুবিধার কথা জানিয়ে আবারো শ্বশুরকে বললো তার মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে। মা- মরা একমাত্র মেয়েকে এ সময় চোখের আড়াল করতে রাজী নন বাউল বৈদ্যনাথ। গ্রামের

মাসীপিসিরা যত্ন নিবেন। তাছাড়া নিজেই তো কত কবিরাজী চিকিৎসা করেন। ইন্দ্রনীল শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল প্রসবের সময় নিজেই চলে আসবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের দু'মাস পূর্বেই প্রসব বেদনা উঠে। প্রচণ্ড ব্যথায় ছটফট করতে থাকে অদ্রী। গ্রামের কেউ কেউ পরামর্শ দেয় শহরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে।

বাউল তার ঔষধে গ্রামের কতজনকে সুস্থ করে তোলে আর নিজের একমাত্র মেয়ের বেলায় যেতে হবে অন্যের কাছে? দিনরাত ধরে বনজঙ্গল ঘুরে ঘুরে গাছের শিকড় বাকড়-পাতা সব জড়ো করেছেন। কিছুক্ষণ পরপর রস করে খাওয়ালেন, সব ধরনের কবিরাজী চেষ্টা করলেন। প্রায় দু'দিন হয়ে গেল। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে নীলাদ্রীর চোখের পাতা মুদে এল। যেন সমুখে শান্তি পারাবার।

ঢং করে বিমানের এ্যানাউন্সমেন্ট-এর ঘণ্টা বেজে উঠে। 'আস্‌সালামু আলাইকুম... কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আপনাদের সিট বেল্টটি বেঁধে নিন। ধন্যবাদ।'

দীর্ঘ দশবছর পর ইন্দ্রনীল দেশের মাটিতে পা রাখবে। আর মাত্র ক'টা মিনিট। তারপর যাবে তার অদ্রীর কাছে, তার ভালোবাসার কাছে। নীলের ভালোবাসা ও কর্তব্যের কোনো কমতি ছিল না কখনো। এখনো নেই। শুধু সে সময় তার রেখে যাওয়া কথানুসারে নিজে আসেনি বলেই কি, এত অভিমান করে এভাবে দূরে চলে যাওয়া অদ্রীর?

বিমান অবতরণ করলো। দরজা খুলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা ব্যাগ নিয়ে নামছে। ইন্দ্রনীলের সাথে কোনো স্যুটকেস-ব্যাগ নেই। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে গাড়ি ভাড়া করলো। সোজা মোহনপুর গ্রামের দিকে। সন্ধ্যার একটু আগে এসে পৌঁছল বাউলবাড়িতে। বিশাল এক ফুলের ঝাড় নিয়ে নামলো গাড়ি থেকে। খুব চমৎকার বিন্যাস করা সে ফুলগুলো। এখনো সতেজ। নীল সোজা তার অদ্রীর কাছে গেল। নীলাদ্রীর মাথার কাছে ফুলগুলো রাখলো। 'অদ্রী, এত অভিমানী তুমি ছিলে, আমি জানতাম না। এতদিন পর মনে পড়ল? দেখ, তুমি ডেকেছো আমি ঠিকই তোমার কাছে চলে এসেছি। অদ্রীকে ছাড়া নীল কি থাকতে পারে?'

বাউল সম্প্রদায়ের প্রথানুযায়ী নীলাদ্রীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে বাড়ির পাশেই। সেখানে বসেই ইন্দ্রনীল একা একা বিড়বিড় করছে। একমাত্র কন্যার শোকে মুহ্যমান বাবা বৈদ্যনাথ বাউলও আর নেই। বাড়িটা বাউল গোষ্ঠিকে দান করে গেছে বৈদ্যনাথ বাউল। সেই থেকে জনমানব শূন্যবাড়িতে বাউলদের আখড়া বসে বিশেষ করে পূর্ণিমা তিথিগুলোতে। আজ সেই শারদীয়া পূর্ণিমা। ইন্দ্রনীল বাড়িটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখল। সেই ঘর সেই দাওয়া সবই আগের মতো আছে। নতুন বাউলেরা কিছু নতুন গান বেঁধেছে। একতারা দোতারার সুর বাজতে শুরু করলো। তাদের আসর শুরু হলো। আবার গাড়িতে উঠে বসলো ইন্দ্রনীল। বিমানবন্দর পানে। শরতের আকাশে পাঁজা পাঁজা মেঘ আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলার পথ বেয়ে রাত তিনটায় উড়ে চললো বিমান মস্কোর উদ্দেশ্যে।

সেইতো আবার

পড়ন্ত বিকেলে দোতলার বারান্দায় লাবণ্য। আকাশে সূর্যের রাঙিয়ে দেওয়া রঙের বৈচিত্র্য পরখ করছিল দোলনায় দোল খেতে খেতে। এই সময়টা লাবণ্যের কাটে একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অথবা নিচে ছোটভাইদের খেলা দেখে অথবা টবে গাছের যত্ন করে। মা বাসার কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাবা অফিস থেকে সোজা চলে যান ক্লাবে, রাতে ফিরেন।

টবে ফুলগুলো ফুটেছে সারি সারি। লাবণ্য উঠে এসে খুব আলতো স্পর্শে ফুলেদের আদর নেয় । বড় কোমল অনুভূতি ।

এরই মধ্যে নিচ থেকে লাবণ্যের ছোটভাই নিপুর একটা ক্রিকেট বল এসে পড়ে বারান্দায়। -'প্লিজ, আপু বলটা দাও না।' নিপু নিচ থেকে অনুরোধ করে। 'আমি পারবো না নিজে এসে খুঁজে নিয়ে যাও। যদি গাছে লাগতো? কতদিন বলেছি না এভাবে বল মারবে না?'

'আর হবে না প্লিজ, এটাই শেষবার।'

'দেখছি, দাঁড়াও কোথায় পড়েছে?' অনেক খুঁজে কষ্ট করে বের করলো দুটো টবের মাঝ থেকে বলটা। নিচে ফেলে দিয়ে বললো 'আর একবার এলে বল দিবো না।'

নিপুর সব বন্ধুরা সমবেত হয়ে কৃতজ্ঞতার স্বরে বলে- 'ওকে আপু,থ্যাংক ইউ আপু।' ক্লাস সেভেনে পড়ে ওরা। কিন্তু যা দুষ্ট! লাবণ্যের সাথে কখন কি রকম ব্যবহার করতে হবে তা ওদের জানা। আর লাবণ্য ওদের মাঝে মাঝে ধমক দিলেও মন থেকে আদর করে। বিকালের নাস্তা বাবুর্চি বাগানের পাতানো চেয়ার টেবিলে দেয়। নিপু বন্ধুদের নিয়ে একসাথে খায়। ওর বন্ধুরা জানে চপ লাবণ্য আপুর পছন্দের খাবার। বন্ধু

টমাস লাবণ্যের উদ্দেশ্যে বলে আপু চপগুলো দারুণ হয়েছে তোমার জন্য রেখে দিলাম একটা।'

'আমার জন্য মায়া দেখাতে হবে না। আমি খেয়েছি তোমরা সাবাড় করো।' 'থ্যাংক ইউ আপু' -বলেই টপাটপ গোগ্রাসে শেষ করে ফেলে সব। লাবণ্য ওদের কাণ্ড দেখছিল আর হাসছিল।

কিছুক্ষণ ধরে বাসার ফোন বাজছে- ওর মা বা অন্য কেউ শুনতে পায় নাই। লাবণ্য ফোনটা উঠালো- 'হ্যালো, হ্যালো।' শব্দ নেই কেটে দিলো। লাবণ্য ফোন রেখে চলে আসছিল আবার ফোন বাজে- 'হ্যালো।' ফোনের ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল শান্ত স্বরে- তুমি লাবণ্য?

হ্যাঁ, আপনি কে? এরই মাঝে মা এসেছে জিজ্ঞাসা করেন-কে রে লাবণ্য? ফোন কেটে গেল।

'জানি না কেটে গেছে লাইন' বলে লাবণ্য আবার বারান্দায় এল। কিন্তু লাবণ্য বুঝতে পারছে না এমন কণ্ঠের সাথে পরিচিতও নয় সে। কে সে? সন্ধ্যা পার হয়েছে- এবার পড়ার টেবিলে যেতে হবে- অনেক পড়া জমে আছে। ঘরে ঢুকতেই আবার ফোন বেজে উঠলো-লাবণ্য ফোন তুললো।

হ্যালো!

কি এত দেরী কর কেন ফোন ধরতে? সেই কণ্ঠ।

কে আপনি?

তুমি ফোন রিসিভ কর না কেন? বার বার ফোন করছি, তুমি ধরছো না। লাবণ্য অবাক। কেমন যেন অধিকারের স্বরে বলছে। পাশ থেকে মা বলছে- 'কে রে?' সাথে সাথে কেটে দিলো। লাবণ্য বললো-'জানি না।'

এর আগেও দু'বার ফোন এসেছিল, হ্যালো বলতেই কেটে গেল। আজকাল টেলিফোনের যা দুরবস্থা। বিদেশ থেকে কল এলেই এমন হয়। মনে হয় তোর ছোট মামা করছে জার্মানি থেকে।' মার কথায় লাবণ্য কিছুটা শঙ্কামুক্ত হলো। অন্তত মা বুঝতে পারছে না যে কোনো একজন লাবণ্যের সাথেই কথা বলার জন্য বারবার ফোন করছে। যদিও লাবণ্য তাকে চিনেও না জানেও না। তারপরও মনের মধ্যে কেমন যেন ভয়-লজ্জা কাজ করছে।

সামনে ভার্সিটিতে ভর্তির টেস্ট। অনেক পড়া। কোচিং, প্রাইভেট আর পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মাথায় নেই কিন্তু এমন ভাবে কেউতো কখনো তাকে ফোন করে নি। মানুষটি যেই হোক না কেন-সে তার নাম জানে কিন্তু কীভাবে? রংনাম্বার নয় এটা নিশ্চিত। তবে কে বার বার ফোন করছে। আবার ইচ্ছে মতো লাইন কেটেও দিচ্ছে। লাবণ্য জানালাটা মেলে পর্দা সরিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। এমন সময় আবার ফোন বেজে ওঠে-লাবণ্য ধরেই বলে আপনি কে? বার বার ফোন করছেন কেন?

'বিকজ আই লাইক ইউ। আই ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ।' ফোন কেটে যায়। কথা বলার সুযোগ নেই। লাবণ্যের ভীষণ রাগ হচ্ছে। কার এত বড় সাহস তাকে ফোনে

একথা জানায়! কারণ লাবণ্যের চলাফেরা মেলামেশা সীমিত গণ্ডির ভিতর। বাবার বদলির চাকরি। বিভিন্ন স্থানে তাদের বসবাস ও লেখাপড়া করতে হচ্ছে। কোথাও তাদের বেশিদিন থাকা হয় না যে পরিচিতের সংখ্যা বাড়তে পারে। আজ রাতে পড়ালেখা তেমন আর হলো না।

সকালে বেশ জ্বরজ্বর লাগছিল লাবণ্যের। ক্লাসে গেল না। নাস্তা না খেয়ে চাদর জড়িয়ে বারান্দায় ঝুলানো দোলনায় বসে আছে। মা রান্না ঘরে ব্যস্ত।

ফোন বাজছে। লাবণ্য ধরলো-হ্যালো বলার আগেই সে বলছে--তুমি ক্লাসে যাওনি কেন

কেন আজ?

আগে বলুন আপনি কে?

আমি? একজন মানুষ।

কোথা থেকে ফোন করেছেন?

তোমার কাছে থেকে।

এসব ইয়ার্কি রাখেন। কি চান বলুনতো? - তোমাকে ভালো লাগে জানাতে চাই।

কি? ফোন কেটে গেল। শরীরে হালকা একটু জ্বর আসায় সে আজ ক্লাসে যায়নি। অথচ ছেলেটি জানলো কীভাবে? লাবণ্যতো মেয়েদের ব্যাচে কোচিং করে।

রাত দশটায় লাবণ্যের বাবা ক্লাব থেকে ফিরে দেখেন লাবণ্যের গায়ে বেশ জ্বর। দাঁতে বেশ ব্যথা। স্ত্রীকে একটু বকা দিলো 'সারাদিনে আমাকে জানাওনি। নিজে তো কোনো ট্রিটমেন্ট দাও নি। মেয়েটার দিকে তোমার কোনও খেয়াল নেই?' বন্ধু ডাক্তার মহিউদ্দিনকে ফোনে জানালেন ভদ্রলোক। ডাক্তার বললো 'আমার চেম্বার খোলা আছে মেয়েকে নিয়ে এসো, দেখি কি হয়েছে।' তখনই লাবণ্যকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন তার বাবা। ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ নিয়ে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো। মেয়েকে ঔষধ খেয়ে ঘুমুতে বললেন।

সকালে লাবণ্য অসুস্থ থাকায় কেউ ঘুম থেকে ডাকেনি। ফোন এল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে লাবণ্য ফোন তুলল। 'হ্যালো।'

কালরাতে কি হয়েছিল? অত রাতে কোথায় গিয়েছিলে? শরীর খারাপ?

আপনি বুঝলেন কীভাবে?

এই অসময়ে অর্থাৎ এত গরমে গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিলে যে?

আচ্ছা আপনি কে আগে বলুন?

কেন, কি দরকার?

'আমিতো অজানা কোনও ব্যক্তির সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নই। আপনি যদি নিজের পরিচয় দিতে না পারেন তবে আর ফোন করবেন না'। লাবণ্য ভাবছে ছেলেটি কে? রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো বখাটে যুবক-টুবক কিনা। ছিঃ, রাস্তার ছেলের সাথে সে কথা বলছে-ভাবতে ভীষণ রাগ হচ্ছে।

আর যদি পরিচয় দিই তাহলে কথা বলবে তো?

মানে?

অর্থাৎ আমার পরিচয় জানানোর পরও তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেতে পারি কি? সেটা পরে দেখা যাবে। আগে আপনার পরিচয়টা দিন।

সব বলবো। কিছুই লুকাবো না, সময় আসুক। ওহ শোন, ঠিকমতো ঔষধ খেও কিন্তু।

ফোন রেখে দিল। লাবণ্য মনে মনে খুঁজছে, কে এই ব্যক্তি। তার

সম্পর্কে সবই জানে-রাতের খবরও বলতে পারে, কে এইজন? বাসায় তো বাইরের তেমন কোনো মানুষও আসে না।

দুপুরে খাবারের পর লাবণ্যের শরীরটা বেশ ভালো লাগছে। মনে মনে ভাবছে ফোনের ব্যাপারটা। মেজাজটা ভালোই এই মুহূর্তে। ফোন এল। বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। লাবণ্যরও কথা বলতে ভালো লাগছে। ছেলেটি কথা দিয়েছে কাল কিছুটা জানাবে তার সম্পর্কে। অর্থাৎ তার পরিচয়। আজ কলেজে ক্লাস শেষ করে তাড়াতাড়ি বাসায় এল। বান্ধবীদের সাথে আড্ডায় সময় কাটায় না। বাসায় এসে গোসল সেরে খেয়ে শুয়ে আছে। কোন ফোন এল না। সন্ধ্যায় গানের টিচার এল। রাতে প্রাইভেট টিচার এসে অংক করায়। সব কিছুতেই অমনোযোগী। দুইজন টিচারের কাছেই ধমক খেলো। রাত ১১টা বাজে। বিছানায় শুয়ে লাবণ্যর ঘুম আসছে না। মন ভালো লাগছে না। এমন সময় ফোন এল -

হ্যালো।

লাবণ্য কেমন আছো?

আজ অতক্ষণে সময় হলো?

কেন ফোনের অপেক্ষায় ছিলে নাকি?

ছিলাম বৈকি!

খুব খুশি হলাম।

কেন?

তুমি যে আমার ফোনের অপেক্ষায় ছিলে।

আজ কিন্তু পরিচয় দেওয়ার কথা, মনে আছেতো? মনে আছে, কিন্তু ভয়ও করছে, যদি তারপর তুমি---আচ্ছা, লাবণ্য তুমি পায়েস পছন্দ করো না?

প্রসঙ্গ এড়াবেন না, আপনার নাম কি?

তোমার আম্মা চমৎকার পায়েস রান্না করে। পায়েস খেও, হয়তো ফ্রিজে আছেও।

সত্যি লাবণ্যের আম্মা পায়েস রান্না করে সুন্দর। যারা খেয়েছে তারা সবাই প্রশংসা করে। কিন্তু ওর ঐ খাবারটা মোটেই পছন্দ নয়, মিষ্টি জাতীয় খাবার ওর ভালো লাগে না, কিন্তু এ জানলো কীভাবে? লাবণ্য একটু চিন্তিত।

আর শোন, তুমি গান শিখ অথচ ভোরে রেওয়াজ করো না। এটা ঠিক নয়। 'লাবণ্য আরো অবাক হলো।

আচ্ছা বলুন তো আপনি কে?

পরে কথা হবে। বলেই ফোন রেখে দিল।

লাবণ্য গিয়ে ফ্রিজ খুললো, সত্যিই বড় বাটিতে পায়েস রয়েছে হিমায়িত। কি আশ্চর্যের ব্যাপার! তাহলে এই লোকটা কে? কিছুই বুঝতে পারছে না। কাউকে অনুমানও করতে পারছে না। তবে যে লোকটি বাসায় এসেছে সেটা ঠিক।

বিকালে নাস্তা দেওয়া হয় দুজন টিচারকে নিয়মিত। লাবণ্যের সন্দেহ এখন তাদের প্রতি। বিকেলে গানের টিচারের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি। যদি তিনিই সেই ব্যক্তি হোন তাহলে মাকে বলে বিদায় দিবে গানের মাস্টারকে। আর বাইরের লোকের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি অংকের টিচার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র। অনেক সময় প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে সুন্দরী,ধনী-কন্যা ছাত্রীদের প্রেমে হাবুডুবু খায়। কিন্তু লাবণ্যের কাছে টিচার মানে টিচার। তাদের শ্রদ্ধা করে। ওর অংকের টিচারের মতো এমনই গম্ভীর টাইপের ছেলের মধ্যে কোনো রোমান্টিকতা থাকতে পারে, লাবণ্যের বিশ্বাস হয় না। মোটা লেন্সের চশমা পরা যুবক টিচারটি কখনো লাবণ্যের দিকে ভালো করে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। তবুও আজ লাবণ্য সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে টিচারকে লক্ষ করছে বার বার। একসময় টিচার ধমক দেয় ‘কি দেখছো অমন করে মুখের দিকে চেয়ে, একটা অংকতো ঠিক হয়নি? করো ঠিক করো।’ লাবণ্য সত্যিই এতক্ষণ মুখের দিকে চেয়েছিল আর অনুসন্ধান করছিল। ভীষণ লজ্জা পেল। এমন কর্কশ ব্যক্তি নিশ্চয় তাকে ফোন করবে না। তবে খুশি এই ভেবে যে অপছন্দের এই দুইজনের কেউ নন, সেই ব্যক্তি। গানের টিচারটা কেমন যেন মেয়েলি স্বভাবের। আর অংকেরটা ভীষণ কাঠখোট্টা ও খিটমিটে স্বভাবের। এদেরকে টিচার হিসাবে মেনে নেওয়া গেলেও অন্য কিছু সম্ভব নয় ।

কিন্তু কেমন যেন অজানা কাউকে ভালোলাগার হাওয়ায় মন দুলতে থাকলো এই প্রথম। পড়াতে মন বসে না। উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। সেখানেও অস্থিরতা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, চিরুনি হাতে নেয়, চুল আঁচড়াতে ভালো লাগে না। মাথায় চিরুনি তুলেও সেটা ফেলে দেয়। ফোনের কাছে গিয়ে বসে রইলো। না, কোনো রিং বেজে ওঠেনি। ক্যাসেট প্লেয়ার অন করলো। নিজেও সাথে সাথে ধরলো গান। এমনি ভাবে অনেক রাত হয়ে গেল। অবশেষে ফোন বেজে উঠল। লাবণ্য ফোন ধরেই বলে-

আজ আমি কথা বলবো এক শর্তে।

কি শর্তে?

আমি না বলা পর্যন্ত আপনি ইচ্ছামতো যখন তখন ফোন রাখবেন না। - আমিও রাখবো না সেই শর্তে-সম্বোধন ‘তুমি’তে এলে।

তাহলে বলো তোমার নামটা।

পিয়াল।

ধন্যবাদ পিয়াল। আমার সম্পর্কে তুমিতো সব জানো আমাকে দেখেছও- যদিও জানি না কীভাবে? এবার তোমার পালা। তোমার সম্পর্কে আরো জানতে চাই। আর লুকাবে না। নিজের পরিচয় উন্মুক্ত করো। তবে সব সত্য বলবে।

ওদের আলাপ জমে উঠেছে ধীরে ধীরে। এভাবে প্রতিদিনই কথা হচ্ছে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। লাবণ্যের আর ইচ্ছা নয় এধরনের রহস্যাবৃত্ত কোনো মানুষের সাথে রাত জেগে ফোনে কথা বলতে। তাই দৃঢ় কণ্ঠে বললো-

এবার তোমাকে দেখতে চাই।

সত্যি দেখতে চাও?

চাই মানে? একশো বার চাই। হাজার বার চাই।

সেটা কি এই মুহূর্তে?

তা কি সম্ভব?

সম্ভব।

কি বলছো। সত্যি! তবে কি তুমি দস্যুরাজের মতো পাইপ বেয়ে হাজির হতে পারবে জানালা দিয়ে?

পারবো।

কি বলছো? দেখিতো।

তাহলে তুমি তোমার জানালার পাশে এসো।’ লাবণ্য হাসতে হাসতে জানালার কাছে গেল। ‘এসেছি’ বললো ।

এবার পর্দাগুলো সরাও।

লাবণ্য মনে মনে একটু ভয় পেয়ে গেল এতরাত! যদিও লোহার গ্রিল ঘেরা কাচের জানালা বন্ধ। নিচেতো নাইট গার্ডদের বাঁশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবুও কোনো অশরীরী নয়তো। ভয়ে ভয়ে পর্দা সরালো। কাউকে দেখতে পেল না।

কই, কোথায়? হাতে ধরা ফোনেই জিজ্ঞেস করছে লাবণ্য।

সামনে তাকাও।

আমার সামনের জানালা ফাঁকা।

আর একটু দূরে তাকাও।

দূরে রাতের অন্ধকার।

একটু খেয়াল করো। ওটা একটা বাড়ি।

‘ওই খানেই চোখ রাখো।’

তাহের আংকেলের বাসা।

একটা নীল লাইট জ্বলে উঠল দু’তলার রুমে। জানালায় একজন টেলিফোন সেট হাতে দাঁড়িয়ে। লাবণ্য অবাক হয়ে দেখছে। বিস্মিত হলো কে এই ব্যক্তি। ওই বাড়িতে রিনি আন্টি, তাহের আংকেল ও তাঁদের একমাত্র কন্যা এনা ছাড়া আর কেউতো থাকে না। পিয়াল কি সত্যি সব বলছে! ঐ বাসায় লাবণ্য গিয়েছে কয়েকবার মায়ের সাথে। রিনি আন্টিও আসেন এনাকে নিয়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু পিয়ালের মতো তো কাউকে কখনো দেখেনি। শুনেও নি।

‘পিয়াল তোমার ঘরের বাতিটা অন করো। ডিম লাইটে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক মতো। শুধু একটা অবয়ব’-।

'কাল দেখে নিও দিনের আলোয়'। পিয়াল বিছানায় ফোন নিয়ে বসলো।

পিয়ালদের দেশের বাড়ি সিলেটে, থাকে ঢাকার বনানীতে। কুমিল্লায় এসেছে রিনিখালার বাসায় বেড়াতে। এই ছোটখালার কাছেই পিয়াল ছোট বেলায় বেশি সময় কাটিয়েছে। নানাবাড়িতে প্রথম নাতির ভীষণ আদর। রিনিখালা তখন ছাত্রী ছিলেন। পিয়াল সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করতো খালার কাছে। ডাকতো 'রিরি বলে'।

কিন্তু এবার কুমিল্লায় বেড়াতে এসে হঠাৎ পিয়ালের পা মচকে যায় সিঁড়িতে। তাই সহসা ঢাকায় ফেরা হয়নি। বড়বোনকে ফোনে জানিয়েছে রিনি পিয়ালের পা সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত কুমিল্লায় থাকবে। ভার্সিটি বন্ধ থাকায় পিয়ালের মায়ের কোনও আপত্তি নেই। আর এই সময়ে রিনিখালার পাঁচ বছরের মেয়ে এনা পিয়ালকে পায় সঙ্গী হিসাবে।

পিয়ালের খালু মি. আবু তাহের সরকারি বড় কর্মকর্তা। লাবণ্যের বাবার সহকর্মী এবং অফিসার্স ক্লাবে খেলার সঙ্গীও। পাশাপাশি বিশাল প্রাসাদসম সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন। সামনে বাগানবেষ্টিত দু'তলা বাড়ি দুটো অপূর্ব সুন্দর। আশেপাশে তেমন বাড়ি নাই। মচকানো পা নিয়ে বসে বসে বারান্দায় সারাক্ষণ কাটে পিয়াল আর এনার।

এভাবেই বারান্দা থেকে লাবণ্যকে দেখা। এনার কাছে লাবণ্য আপুর গল্প শোনা, ভালো লাগা। মফস্বল শহরের ফোন নম্বরগুলো মনে রাখা সহজ। অল্পসংখ্যক ডিজিটের। আর সরকারি নম্বরগুলো পরপর থাকে অফিসারদের। লাবণ্যর নম্বর এনার মুখস্থ। কয়েকদিন পিয়াল ভাইয়াকে দিয়ে নম্বর লাগিয়ে আপুর সাথে গল্প করেছে। মুখোমুখি বারান্দায় পিয়াল মুগ্ধ হয়ে লাবণ্যকে দেখতো দোলনায় দোল খেতে। ফুল গাছের যত্ন নিতে। তাছাড়া লাবণ্যের বেড রুম, এনাদের গেস্ট রুমও মুখোমুখি মাঝে একটা ফুলের বাগান। সেদিন লাবণ্য দুপুরে কলেজে গিয়েছিল। রিনি আন্টি পিয়ালকে বললো- 'লাবণ্যের আম্মার কাছ থেকে একটা রান্নার বই এনেছি অনেক দিন হলো। ওটা ফেরত দিতে হবে। এনাকে নিয়ে বইটা দিয়ে এসো।'

সেদিন প্রথম লাবণ্যের বাসায় পিয়াল এসেছিল। লাবণ্যের মায়ের হাতে পায়েস খেয়েছিল। অনেক গল্প করেছিল ওর মার সাথে। ঘরের কোনে হারমোনিয়াম-তবলা দেখে পিয়াল জিজ্ঞেস করেছিল 'গান কে করে?' এভাবেই লাবণ্যকে জানা পিয়ালের।

সব ঘটনা অনাবৃত হয়ে যায়। সকল রহস্যের জাল ভেদ করে পিয়াল সকালে বারান্দায় এসে বসে।

আজ লাবণ্যের বারান্দায় দাঁড়াতে কেমন যেন লাগছে। এক সময় বারান্দায় এল। সত্যি এনাদের বারান্দায় এক যুবক চেয়ারে বসে পেপার হাতে। লাবণ্যের ইচ্ছা হচ্ছে ভালো করে দেখতে। এক সময় যুবক ইশারায় বললো ফোন তুলতে। ফোন বেজে উঠল। রুমে ঢুকতেই লাবণ্যের মা ফোন তুললো। লাইন কেটে গেল। দুবার এমন হবার পর লাবণ্য রুমেই বসে রইলো। এবার ফোন তুললো।

পিয়াল দেখা করতে চায়। লাবণ্যের আপত্তি নেই। কিন্তু কোথায়?

কাছেই রানীকুঠির পার্কের এ কোণে দেখা করা যায় কিন্তু অত সাহস লাবণ্যের নেই। অবশেষে ছাদই উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য হলো।

বিকালে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে। ছাদে প্রচণ্ড বাতাসে লাবণ্যের একঝাড় চুল উড়ছে। ইচ্ছে হয়েছিল পিয়ালের ওর চুলগুলো একটু ছুঁয়ে দেখতে। ইচ্ছে হয়েছিল আজ ওর গান শুনবে। কিন্তু বৈরী বাতাসে গান তো দূরের কথা দাঁড়ানোই মুশকিল। ঝড় আসছে প্রবল বেগে এখুনি মায়ের ডাক পড়বে। লাবণ্য তাই দ্রুত নেমে যায়।

পিয়ালের যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। পা পুরোপুরি সুস্থ। মা ঢাকা থেকে বারবার ফোন করছে যাবার জন্য। একথা এই মুহূর্তে বলে লাবণ্যের মন খারাপ করবে না, পরে জানাবে।

রাতে পিয়াল ফোনে জানালো।

তোমার একটা জিনিস আমার কাছে অলৌকিকভাবে এসেছে।

কি জিনিস?

আগামীকাল দেখাবো। পরদিন আবারো দেখা হলো। লাবণ্য জানতে চাইলো।

জিনিসটা কি?

চোখ বন্ধ করো। লাবণ্য তাই করলো। হাতের মুঠি লাবণ্যের সামনে ধরে বললো চোখ মেলতে। গতকাল তার কান থেকে পড়ে যাওয়া ছোট্ট একটি কানের দুল ওর হাতের মুঠির মধ্যে। বাসায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে খুলতে গিয়ে দেখেছে কানে একটা নেই। ইমিটেশনের দুল তো। তাই খোঁজ করার অত প্রয়োজন বোধ করেনি।

লাবণ্য সেটা নিতে চাইলো, পিয়াল দিলো না। কাড়াকাড়ি করেও পিয়ালের হাতের মুঠো খুলতে পারেনি লাবণ্য। এটা প্রাপ্তি সূত্রে মালিকানা দাবি করলো পিয়াল। তাই নিয়ে নিলো।

পিয়াল ঢাকায় চলে যাবে ট্রেনের টিকেট কাটা হয়েছে। লাবণ্যকে বললো- 'ঢাকায় থাকলে মন পড়ে রবে এখানে। বন্ধ পেলেই এখানে আসবে। তাছাড়া চিঠিতো লিখবেই।' রাতে মিসেস তাহের লাবণ্যের আব্বাকে ফোনে বললো- –ভাই সাহেব, আমার বোনের ছেলে কাল ঢাকায় যাবে। আমাদের গাড়িটা নষ্ট আপনার গাড়িটা যদি দেন তাহলে ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতো। লাবণ্যের বাবা জিজ্ঞেস করলো-কখন?

ট্রেন ছাড়বে সকাল আটটায়। বাসা থেকে কিছুক্ষণ আগেই বের হবে। স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি চলে আসবে।

লাবণ্যের ক্লাস সাড়ে আটটায় অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে ভাবী আমার গাড়িটা নিয়ে যাবেন।

আমরা যাবো না, আমার ভাগ্নে পিয়াল শুধু যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাবী।

এদিকে ওদের কথা বলতে বলতে মধ্যরাত পার হলো। শেষরাতটুকুও ফুরিয়ে গেল। এক সময় ভোরের আজান শোনা গেল। লাবণ্য বললো--তুমি জার্নি করবে সকালে, রাতে ঘুমুলে না এটা ঠিক হলো না।

ঘুমুতে পারবো অনেক কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ পাবো কোথায়? ট্রেনে না হয় ঘুমুতে ঘুমুতে যাবো। তুমি কি জানো আমি কিন্তু স্টেশনে যাচ্ছি তোমাদেরই গাড়ি নিয়ে।

জানি, বাবা বলেছে। তোমাকে পৌঁছে দেবার পর আমি যাবো ক্লাসে।

কথা শেষে বিদায় জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ফোন রেখে দিলো দুজন। সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিয়ালের চলে যাওয়া দৃশ্য লাবণ্যের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ওকে আর একটু দেখার ইচ্ছাও সংবরণ করতে পারছিল না লাবণ্য। পিয়াল গাড়িতে উঠছে পাশে রিনি খালা, এনা ও খালু। শুধু চোখাচোখি হলো দুজনের। একফাঁকে গাড়িতে ঢোকার ভঙ্গিতে লাবণ্যের উদ্দেশ্যে হাত উঁচু করলো। গাড়ি স্টার্ট দিলো। কেউই বুঝলো না শুধু দুজনেই জানে কে কাকে বিদায় জানাচ্ছে। গাড়িটা যেন বুকের উপর দিয়ে দুমড়ে মুচড়ে পিয়ালকে নিয়ে চলে গেল।

ক্লাসে যাবার জন্য লাবণ্য তৈরি। রেলস্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি এসেছে আবার। লাবণ্য গাড়ির পিছনের সিটেই বসে বরাবর। একটু আগে পিয়ালও সেখানে বসেছিল। ক্লাসের উদ্দেশ্যে চললো লাবণ্য। সিটের উপর সুন্দর র‌্যাপিং পেপারে মোড়ানো একটা প্যাকেট। ভাবলো পিয়াল হয়তো ভুল করে রেখে গিয়েছে। হাতে তুলে নিল। ছোট্ট কাগজে লেখা 'ফর লাবণ্য'। লাবণ্য আস্তে আস্তে খুললো বক্সটা। দেখে বক্স ভর্তি বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর কানের দুল। মনে মনে ভাবছে এমন পাগলামীও পিয়াল জানে।

বাসায় এসে একটা একটা করে দুল কানে মিলাচ্ছে আর আয়না দিয়ে দেখছে। আয়নায় মনে হলো পিছন থেকে হাত ইশারায় পিয়াল দেখাচ্ছে বেশ লাগছে। লাবণ্য ফিরে দেখে পিছনে কেউ নেই। আজ বারবার যে একই ভুল হচ্ছে। গাড়িতেও বারবার মনে হচ্ছিল, পাশে পিয়াল বসে কথা বলছে। অথচ কেউ নেই। মুহূর্তে মন খারাপ হয়ে যায়। লাবণ্য সব গুছিয়ে রেখে দেয় আর পরা হয় না দুলগুলো ।

পরদিন রাতে ফোন এল। অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে না। অল্প একটু কথা বলেই রেখে দিতে হলো। ঢাকা থেকে লাইন পাওয়াই যায় না। কথা তেমন হয় না। একদিন চিঠি আসে পিয়ালের অনেক লম্বা চিঠি। চিঠির শেষের এই কথাগুলো যেন লাবণ্য মেনে নিতে পারছে না।

'একটা সুযোগ হলো আমেরিকা যাবার, আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে ঠিকানা দিবো-সে ঠিকানায় লিখো। যাবার আগেতো ফোনে কথা হবে।'

লাবণ্যের বাবা অফিস থেকে এসে জানালো, তার ঢাকায় ট্রান্সফার হয়েছে। লাবণ্য বেশ খুশি।

একদিন একদিন করে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। পিয়ালের কোনো চিঠি এল না। লাবণ্য দিন দিন অস্থির হয়ে উঠছে। অবশেষে একদিন তারা সপরিবারে ঢাকায় রওনা হলো। এরইমধ্যে রিনি আন্টিরাও চলে গেছে অন্য জায়গায় বদলী হয়ে। যোগাযোগের আর কোনও উপায় থাকলো না।

বেশ কয়েক বছর পার হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী লাবণ্য। সহপাঠী অনেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা-মাকে বলেছিল 'পড়ালেখা শেষ না করে বিয়ে করবো না।' কিন্তু এবার আর কোনো অজুহাতে বিয়ে ঠেকাবে? পরিবারের সকলে চিন্তিত? কেন লাবণ্যের বিয়েতে অনীহা। নিজের কোন পছন্দ থাকলেও জানতে চায় বাবা-মা। তাও নাকি নেই।

মনের মধ্যে পুষে রাখা স্মৃতিগুলো কিছুতেই মুছতে পারছে না সে। অবশেষে বাবা-মার পীড়া-পীড়িতে সে বিয়েতে মত দেয়। তোমাদের পছন্দের ছেলের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করো। আমার আপত্তি নেই।'

সকলেই মহা খুশি আজ। এতদিন পর হলেও লাবণ্য বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। অনেক ভালো ভালো পাত্র হাত ছাড়া করেছে। এবারের পাত্রও খুব ভালো, বিদেশ ফেরত ভালো ফ্যামিলি। লাবণ্যর মা বান্ধবীকে ছেলের ছবি দেয় লাবণ্যকে দেখানোর জন্য। বান্ধবীরা ছবি নিয়ে বেশ ঠাট্টা মশকারা করলেও তাতে কোনো আগ্রহ নেই। ছবিটার দিকে সে চোখ ফিরেও তাকায় না।

দেখ দারুণ চেহারা, মানাবে। বান্ধবীরা বলে।

মিলন আমার দেখতে হবে না, তোরা দেখ।

বুঝছি লজ্জা হচ্ছে-বিছানার নিচে রাখলাম রাতে একা একা দেখিস। 'যা এখান থেকে' লাবণ্য ধমক দেয়। ছবিটা ওভাবে বিছানার নিচে পড়ে থাকে। লাবণ্যের কোনও উৎসাহ নেই।

লাবণ্য বান্ধবীকে নিয়ে বের হয়েছিল টুকটাক কেনা-কাটার জন্য। আড়ং থেকে শপিং করে ওরা বের হয়ে যাবার সময় এক যুবকও আড়ং-এ প্রবেশ করলো। লাবণ্যরা পাশের একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকলো খেতে। খেয়ে ওরা কাউন্টারে এল টাকা দিতে। হাতের শপিং ব্যাগটা পাশের টেবিলে রাখে। এতক্ষণে সেই যুবকটি আড়ং থেকে কেনাকাটা করে একই ফাস্টফুডের দোকানে এল। পাশের টেবিলে সে তার শপিং ব্যাগ রেখে শোকেসের খাবার মেনু দেখে দেখে অর্ডার দিচ্ছিল বাসায় খাবার নিয়ে যাবে।

টাকা জমা দিয়ে লাবণ্যরা টেবিল থেকে শপিং ব্যাগ নিয়ে চলে গেল। একটু পর খাবারের প্যাকেট নিয়ে যুবকটাও চলে গেল।

লাবণ্যরা বাসায় গিয়ে শপিংব্যাগ খুলে দেখে যা কিছু কিনেছে তার কোনো আইটেমই ব্যাগের মধ্যে নেই। নিশ্চয় আড়ং থেকে ব্যাগ পাল্টে গেছে। বান্ধবী শীলা জানালো 'না, ঘটনাটা ওখানে ঘটে নাই। তুই যখন ফাস্টফুডের দোকানে খাবার পর কাউন্টারে গিয়েছিলি টাকা দিতে তখন। ঐ দোকানে একজন এসেছিল একই রকম আড়ংয়ের ব্যাগ হাতে করে। সেও আমাদের পাশের টেবিলে ব্যাগ রেখেছিল। আমি অবশ্য এটা তুলে নিয়েছিলাম হাতে আমাদের ব্যাগ ভেবে। হয়তো সেখানেই ঘটেছে কারবারটা।' কি আর করা, কোথায় পাবে তার ব্যাগ? তবুও লাবণ্য ও তার বান্ধবী সেই দোকানে গিয়ে বললো সব ।

দোকানী জানালো একজন লোক এসে একই কথা বলে গিয়েছে। ফোন নম্বর রেখে গিয়েছে যোগাযোগ করতে পারেন। ওরা নম্বর নিয়ে বাসায় এসে ফোন করলো তাকে। ব্যাগ দুটো কোথায় দেওয়া নেওয়া করা যায়? ঠিক করলো একই দোকানে আসা হোক। শীলার কাজ আছে বলে চলে গেল বাসায়। লাবণ্য একাই বের হলো। দোকানের একপার্শ্বের টেবিলের উপর ব্যাগ রেখে চেয়ারে বসে লাবণ্য। তার ব্যাগের জন্য অপেক্ষা করছিল। যুবকটি ব্যাগ নিয়ে সোজা চলে গেল লাবণ্যের টেবিলের

কাছে। টেবিলে রাখা ব্যাগ দেখে চিনতে অসুবিধা হয় নাই। পিছন থেকে যুবকটি এসে বিনয়ের সুরে বললো 'সরি, আই এ্যাম এক্সট্রিমলি সরি।'

'ইটস্ ওকে'। বলে চোখে চোখ পড়তেই স্তম্ভিত।

আর কোনো ভাষা নেই। যার অপেক্ষায় এতগুলো বছর পার করেছে, সে আজ সম্মুখে। ঢাকায় এসেও বহু খুঁজেছে তাকে কিন্তু কোনো হদিসই পায়নি তার। গেঁথে আছে মনে অবহেলার কষ্ট, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জ্বালা। এইতো সেই মানুষ যে তার সাথে দুদিনের খেলা খেলেছিল । হয়ত তখন কুমিল্লায় অবসর সময় কাটানোর জন্য তার সাথে মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয় করেছিল। কিশোরী সারল্যের সুযোগ নিয়েছিল। আর ঢাকায় এসে তাকে এড়াবার জন্য আবারো মিথ্যা বলেছিল বিদেশ যাবার কথা। বহু প্রতীক্ষার পর তার আশা বাদ দিয়ে যখন বাবা-মার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তখনই দেখা মিললো। কিন্তু পরশু গায়ে হলুদ। সব আয়োজন শেষ। হাতে ঝক ঝক করছে শাশুড়ির পরিয়ে দেওয়া এনগেজমেন্ট রিং। আজ এখন আনন্দমুখর পরিবেশে সে সব কষ্টের রেখা আর টানতে চায় না। সব কথাই পিয়াল ধৈর্য ধরে শুনলো। তারপর বললো- 'এবার আমার কথা শোন।'

পিয়াল তার সব কথা বললেও এটুকু বলেনি তারও যে বিয়ে ঠিক হয়েছে বাব-মার পছন্দে। হয়ত সে কথা এমুহূর্তে তার মনেও নেই । কারণ সেও দেখেনি পাত্রীটি কে।

সেতো ঠিকই চিঠি লিখেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের পোস্ট অফিস সে বার কী কারণে ঠিক সময়ে পৌঁছে নাই। আর যখন পৌঁছালো তখন লাবণ্যরা সেখানে নেই। রিনি খালারাও বান্দরবন বদলী হয়ে গিয়েছিলেন আরো আগে। রিনি খালাকেও পিয়াল ফোন করেছিল আমেরিকা থেকে যদি কোনো খোঁজ পাওয়া যায় লাব্যণের।
কিন্তু তখন রিনি খালাদের সাথে কারো যোগাযোগ ছিল না। অতএব লাবণ্যের ঠিকানা পিয়ালের সন্ধান করা আর সম্ভব হয় নাই। বিয়ে ঠিক হবার আগেও পিয়াল রিনি খালাকে বলেছিল লাবণ্যের কোনো খোঁজ জানতে পেরেছে কিনা। কিন্তু এতদিনে ওর খালু সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। এখন সবাই থাকে চট্টগ্রামে। খালা শুধু বললো- 'তোর এত পছন্দ ছিল! বোকার মতো আগে কেন আমাকে জানাস নাই। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে। তোর বাবা- মার পছন্দ নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। আমি ঢাকায় আসছি তোর বিয়ে খেতে।' অগত্যা পিয়াল মেনে নিয়েছে সবই ভাগ্যের খেলা।

তারপরও লাবণ্যর দেখা এতদিন পর মিলেছে এটাও নিশ্চয় ভাগ্যের খেলা। তাই লাবণ্যকে বললো- 'এখনও সময় আছে- দেখ, কিছু করা যায় কিনা। '

আজ এত বছর পর পিয়ালের সব কথাই যে বিশ্বাস করতে হবে তারই বা কি মানে আছে। এতদিন সে কোথায় ছিল কীভাবে ছিল তাইবা কে জানে। এদিকে বিয়ের কার্ড ছাপানো ও বিলি-বণ্টন শেষ। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই জানে এবং বাসায় আসতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত পাল্টানো সম্ভব নয়। বাবা-মার মুখে চুনকালি মাখতে পারবে না লাবণ্য। অতএব লাবণ্য তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। এক পর্যায়ে বিদায় নিয়ে দুজন-বাসায় ফিরলো।

সানাইয়ের মিহি সুরে ভোরের ঘুম ভাঙ্গল লাবণ্যের। মাথাটা ঝিমঝিম করছে- কি করবে? বার বার কানে বাজছে পিয়ালের কথা- 'এখনো সময় আছে।' সত্যিই আর কয়েক ঘণ্টা পর সে সময়ও পার হয়ে যাবে। এবার পেয়েও হারাবে সারাজীবনের জন্য তাকে। ফোনের কাছে এল-পিয়ালকে একটা ফোন করবে রিসিভারটা হাতে তুললো। এমন সময় লাবণ্যের মা চোখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলো 'মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নাও' বলে মাথায় একটা চুমু দিয়ে কোনো রকমে বাধভাঙা কান্না চেপে ঘর থেকে দ্রুত চলে গেলেন। লাবণ্য লক্ষ করছে তার মা সামনে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। গোপনে শুধু কাঁদেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে। মায়েদের মন এমনই থাকা স্বাভাবিক। আর এই সময় যদি লাবণ্য পিয়ালের হাত ধরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়? পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে? ফোনের রিসিভারটা আবার রেখে দিলো।

বাড়িতে ভীষণ হৈচৈ। অকারণ হাসাহাসি মাতা-মাতি। রিনি খালা ঢাকায় আসার পর বোঝা যাচ্ছে বাসায় কোনো উৎসব হতে যাচ্ছে। ভীষণ আমুদে মহিলা তার প্রিয় ভাগ্নের বিয়ে তাই তার হৈ চৈ টাও একটু বেশি। পিয়ালের মার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ড্রইং রুম থেকে বললো- 'বড় আপা, তোমার হবু বৌমার ছবি টবি দেখাও, আমরা একটু দেখি, সবই তো নিজে নিজে করলে।' কয়েকটা ছবি রিনি খালার হাতে দিয়ে 'এই নে দেখ। আমি আসছি' বলে ব্যস্ত হয়ে কি যেন করতে গেলেন পিয়ালের আম্মা। রিনি খালা প্যাকেট থেকে ছবিগুলো তুলে দেখলেন- 'ওমা এ যে স্বপ্নের রাজকন্যা। পিয়াল, পিয়াল দেখেছিস'। বলে পিয়ালের রুমে গেলেন। পিয়ালকে জড়িয়ে ধরলেন। আর মেলে ধরলেন ছবিগুলো। পিয়ালের মা রান্না ঘরে ব্যস্ত। রিনি এসে বলে 'বড় আপা, ভালোই কাণ্ড করেছ দেখি। এদিকে এসো।' 'আসছি একটু দাঁড়া'। রিনির আর সহ্য হচ্ছিল না। বোনকে হাত ধরে টেনে এনে সোজা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

সব শুনে বড়বোন পিয়ালের আম্মা বললো- 'তাইতো পিয়ালের মেয়ে দেখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহই ছিল না। সব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। আমিও ভাবছি এ যুগে এ হয়! শেষপর্যন্ত কি আর করা, নিজেই সব ঠিক করেছি। তুই তো চিনিস। আমার ছোটবেলার বান্ধবী কেয়া। ওই ঘটকালি করলো।'

বড় আপা তুমি যা দেখালে না শেষমেষ।

আমি আর কি করলাম। সবই ভাগ্যের খেলা। আমি তো কিছুই জানতাম না। কত জিজ্ঞাসা করেছি পিয়ালকে তোর কোনো পছন্দ থাকলে বল আমি ঝামেলা থেকে বাঁচি। আজ তুই না বললে আমিও কোনোদিন জানতামই না।

যখন জানতেই না, তাই এখনো না জেনেই থাকো। মিরাকল আর কি?

লাবণ্য ভাবছে হঠাৎ করে কেনই বা এতদিন পর দেখা হলো পিয়ালের সাথে। অচেনা অজানা কারো সাথে বিয়ে হতো সেই ভালো ছিল কিন্তু আজকাল কি এমন বিয়ে হয়? ছেলেমেয়ে কেউ কাউকে দেখেনি আলাপও করেনি? লাবণ্যের নাহয় এ বিয়েতে তেমন আগ্রহ নেই। কিন্তু এই ছেলেটি? সেতো আধুনিক ছেলে আমেরিকায় থাকতো। সেওতো লাবণ্যের সাথে বিয়ের আগে কোনো দেখাশোনা এমনকি কথা পর্যন্ত বলেনি। তাহলে কি তারও এ বিয়েতে আগ্রহ নেই? এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলো লাবণ্যকে কৌতূহলি করে তোলে। যাইহোক লাবণ্য তার সাথে দেখা করবে। পিয়ালকে

ভালোবাসার কথা বিয়ের আগেই ছেলেকে বলবে। যদি সে মেনে নেয় তবে ক্ষতি নেই। তাই বলে যেখানে সারাজীবনের সম্পর্ক। সেখানে লুকোচুরি নয়।

বিছানার নিচ থেকে বান্ধবীর রেখে যাওয়া হবু বরের ছবিটি একবার দেখতে ইচ্ছে হলো। সেখানে ছবিটা পেল না। মায়ের কাছে ছেলেটির ফোন নম্বর চাইতে লাবণ্যেও কেমন যেন লজ্জা লাগছে। শীলাকে ফোন করে ছেলেটির নম্বর জোগাড় করে দিতে বললো।

ছেলেটি তাকে তার অফিসে দেখা করতে বলেছে। লাবণ্য একাই বের হলো। লাবণ্য রিসিপশনে অপেক্ষারত। কিছুক্ষণ পর রিসিপশনিস্ট এসে বললো 'ভিতরে যান। স্যার রুমে আছেন।' খুব সুন্দর ছিমছাম সাজানো গোছানো অফিস। দেখে তার রুচির তারিফ করতে হয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমের দরজা খুলে প্রথমেই কাউকে চোখে পড়লো না। দরজা বরাবর একটি টেবিল তার সামনে দুটো চেয়ার পাতা আছে। কিন্তু অপরপ্রান্তের সেন্ট্রাল চেয়ারটি উল্টোদিকে মুখ করে ঘোরানো। সেখান থেকেই বলছে 'ভিতরে আসুন।' লাবণ্য প্রবেশ করলো। বললো 'বসুন।' তার মুখোমুখি চেয়ারে বসলো। উল্টোদিকে ঘুরেই লোকটি জিজ্ঞেস করলো 'আফিস চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?' লাবণ্য কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে তবুও নরম স্বরে বললো 'না'। এবার লোকটি তার পিছনের দিকে লাবণ্যের উদ্দেশ্যে একটি হাত বাড়িয়ে দেয়। লাবণ্য জিজ্ঞেস করলো 'কি'? হাতের মুঠি মেলে ধরলো। 'এটা কি চিনেন?' ভালো করে পরখ করলো। লাবণ্য ঠিকই এবার চিনতে পারে। সেই কবেকার কথা। এটা সেই ইমেটেশনের কানের দুল। যা ছিল পিয়ালের কাছে। আর কি কিছু বলার আছে?

লাবণ্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এটা এখানে এল কীভাবে? শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছে। বুকের থর্‌থর কম্পন ক্রমাগত বেড়েই চলছে। দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। তার বিগত জীবন এর কাছে স্পষ্ট। এবার কি হবে? লোকটি এবার চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো। লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ফেলে। লাবণ্যের এ চোখে আর কিছু দেখা সম্ভব নয়। আর সাহস হচ্ছে না কে এই ব্যক্তি তাকে দেখার।

লোকটি লাবণ্যের মুখখানা দুহাতে ধরলো। আস্তে বললো-'লাবণ্য লুক, ওপেন ইউর আইজ। লুক এ্যাট মাই ফেস। সি, আই এ্যাম ইয়োর্স।'

লাবণ্য বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়েই রইলো। হঠাৎ হাসির প্লাবনে ভেসে গেল লাবণ্য ও পিয়াল ।

একলা আকাশ

মধ্যরাতে গভীর নিদ্রায় নাসিমা। পাশেই তার দু'টি শিশুকন্যা জড়াজড়ি করে ঘুমে। আসলে সারাদিনের খাটুনি শেষে নাসিমা যখন ঘরে ফিরে তখন তার ফিনফিনে রোগাটে শরীরটা আর চলে না। ভোরবেলায় উঠেই ছুটতে হয় মহাখালির 'বিসমিল্লাহ' হোটেলে। সেখানে সবজি কাটা, মশল্লা বাটা, এরপর সারাদিনে দফায় দফায় কাস্টমারদের এঁটো থালাবাসন মাজা-ঘঁষা। সন্ধ্যার পর হোটেলের হাঁড়ি পাতিল মেজে-ধুয়ে পরিষ্কার করে ঘরে ফেরে। নাসিমা দিনের বেলায় তিনবছর বয়সের কন্যা মনিকাকে রেখে আসে তার সাতবছরের কন্যা আনিকার কাছে। ওরা সারাদিন মায়ের রেখে যাওয়া খাবার টুকটাক খায় আর খেলা করে বেড়ায় কড়াইল বস্তিময়। সন্ধ্যা হলেই খেলার সাথিরা যে যার ঘরে আর ওরা দু'বোন মায়ের জন্য অপেক্ষায়। নাসিমা হোটেলে বাসন ধোয়ার সময় কাস্টমারদের বেঁচে যাওয়া বা উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো সংগ্রহ করে। রাতে বাড়ি নিয়ে মেয়েদের সাথে নিয়ে খায়। তারপর লম্বা ঘুম। সেই গভীর ঘুমের মধ্যে মাঝরাতে নাসিমা যেন হালকা শুনতে পাচ্ছে বাইরে শোরগোল। পাশ ফিরে ছোট মেয়ে মনিকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আবারো ঘুমুতে থাকে। এবার শোরগোল আরো জোরে আরো স্পষ্ট। চিৎকার ছুটাছুটি শুনতে পেল, 'আগুন! আগুন! বের হও কে কে আছো ঘরে।' নাসিমা ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছে। বিছানা থেকে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। বাচ্চা দুটোকে দু'হাতে ছোবল দিয়ে খিড়কি খুলে দৌঁড়ে বের হয়।

কড়াইল বস্তির ঘরগুলো পাশাপাশি গা ঘেঁষা। আগুন দ্রুত এক ঘর থেকে পাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। ধেয়ে আসছে নাসিমার ঘরের দিকে। চিৎকার কোলাহল আর্তনাদ চারিদিকে। কেউ কেউ কলস-বালতি ভরে পানি ঢালছে। কেউ আবার দা- ছুড়ি দিয়ে বেড়া কেটে দিচ্ছে যাতে আগুন এগোতে না পারে। এ কাজগুলো করছে পুরষ লোকেরা। নাসিমার ঘরে কোন পুরুষ মানুষ নাই। আগুনের সাথে পাল্লা দিয়ে ঘরের বেড়া কেটে দেবে কে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় নাসিমার হঠাৎ মনে পড়লো ঘরে তার টিনের স্যুটকেস আছে। বড় মেয়ের কাছে ছোট মেয়েটাকে রেখে দৌঁড়ে গিয়ে স্যুটকেসটা বের করে আনে। আগুন ঘরের একপাশের বেড়ায় দাউদাউ করে জ্বলছে। সে আবার

দৌড়ে ভিতরে ঢোকে কিছু জিনিসপত্র যদি টেনে আনতে পারে। লোকজন চিৎকার করে ওঠে,' ঘরে যেও না, এখুনি ঘরের চালটা ভেঙ্গে পড়বে'। তবুও সে দৌড়ে যায় ভিতরে। তাকে পারতেই হবে। তার সব সঞ্চয় সব সম্বল এখানেই। এই ঘরটি তার জমানো টাকা ও কিস্তিতে নেওয়া লোনের টাকায় বানানো। লোনের টাকা এখনো পরিশোধ হয়নি। নাসিমা ঘরে ঢুকে সামনে যা পায়, বিছানার চাদরে রেখে দু'হাতে সাপটে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। আগুনের ঝাপটা হাতে মুখে লাগলেও বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় সে। কিছুক্ষণ পর ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এলো, টিভি ক্যামেরায় লাইভ দেখাতে শুরু করলো। সাংবাদিক ছবি তুললো। অনেক দর্শনার্থী ফেসবুকে প্রচার করতে লাগলো। আরো এলো স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা, যাদের ইলেকশনের সময় বস্তিতে বেশি দেখা যায়। তবুও নাসিমার চোখের সামনে ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সারাদিন কান্নাকাটি হা পিত্যেশ করে কেটে গেল।

রাতে থাকার জায়গা কই! শীতের রাতে কোথায় আশ্রয় নিবে শিশুকন্যা দু'টিকে নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিলো দেশে ফিরে যাবে। দেশ বলতে সে যেখানে বড় হয়েছে সেটাকে বোঝে। নিজের দেশ কোথায় তা সে জানে না। কারণ শুনেছে খুব ছোটবেলায় তার মাকে ফেলে বাবা কোথায় যেন চলে গেছে। শিশুকালেই নাকি মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল তাই মায়ের কথাও মনে নাই। বড় হয়েছে গোপালগঞ্জের ফুকরা গ্রামের খান বাড়িতে। অবস্থা সম্পন্ন পরিবার। গ্রামের মাথা বলতে এই পরিবার। গৃহকর্তা খান সাহেবকে মামা ও তার স্ত্রীকে মামী ডাকে। এই বাড়িতে কাজকাম করে বড় হলেও তাকে প্রায় সন্তানতুল্য স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যখন নাসিমা। গ্রামের বেশ কিছু মেয়েরা গার্মেন্টসে কাজ করে। তারা বাড়ি ফেরে কেমন সুন্দর সালোয়ার কামিজ, থ্রি পিস পরে। ওরা ঢাকা শহরের গল্প করে, নাসিমা অভিভূত হয়ে শুনে। ঢাকার শহর যেন রূপকথার শহর। নাসিমার ইচ্ছে জাগে সেই রঙিন ঢাকার শহরে যেতে। একদিন সাহস করে বলেই ফেলে মামিকে তার ইচ্ছের কথা। পাশের বাড়ির রহিমার সাথে তার কথা হয়েছে। সে নাকি সাথে নিয়ে চাকরিও দিয়ে দিতে পারবে। রূপকথার শহরের বাসিন্দা হতে পারবে। মামির ইচ্ছে না থাকলেও তার অতি আগ্রহ দেখে সম্মতি দেন । মামির কাছ থেকে সুঁই সুতার কাজ, হাতমেশিনে সেলাই করা সবই শিখেছে। মামির ঘরে যখন ছোট মেয়েটি জন্ম নিলো নাসিমাই মেশিনে সেলাই করে তৈরী করেছিল তার জন্য ছোট ছোট ফতুয়া ও জামা ।

ঢাকায় এসে পোশাক কারখানায় চাকরি নিয়ে রহিমার সাথেই থাকে। ঘর ভাড়া ও বাজার দু'জনে শেয়ার করে। ওদের সহকর্মী আবেদ নাসিমাদের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলে । হালকা গড়নের নাসিমা শ্যামলা হলেও দেখতে মন্দ নয়। বন্ধের দিনে, হাতির ঝিল, চিড়িয়াখানা বা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায় আবেদ। নাসিমা তার প্রেমে পড়ে যায়। এভাবে ঘোরাফেরা নাসিমার পছন্দ নয় তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়। রহিমার মাধ্যমে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে আবেদ জানায় তার কোন আপত্তি নাই। তবে তার মায়ের ইচ্ছে পুত্রের বিয়ে দিয়ে কিছু নগদ টাকা পাওয়া। যে টাকা দিয়ে বাড়িতে ঘর তুলবে, নববঁধু সে ঘরে উঠবে। এই কথাগুলো খান সাহেবের স্ত্রী অর্থাৎ নাসিমার পালক মামির কানে গেলে সে তখন আবেদকে তার বাড়িতে আসতে বললো। তার সাথে কথাবার্তা বলে বিয়ের দিন ঠিক করলেন এবং বিয়ের পর তাকে

নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবেন বলে কথা দিলেন। খান সাহেব মোটামোটি আনুষ্ঠানিকভাবে নাসিমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের মেয়ের মতই ছোটকাল থেকে এতিম নাসিমাকে দেখেছেন। বর-বৌয়ের কাপড় চোপড়, কানের দুল, গলায় সোনার চেইন তিনি গড়িয়ে দেন নাসিমার জন্য। বিয়ের পর কড়াইল বস্তিতে ঘরভাড়া করে দু'জনে সংসার পাতে। আবেদ যৌতুকের টাকা দিয়ে তার বাড়িতে ঘর তুলে নববঁধু নাসিমাকে নিয়ে যায় শ্বশুরবাড়িতে। গ্রামের সবাই আসে বউ দেখতে। আসে আবেদের মামাতো বোন শামিমাও। সে নাসিমার হাত পা চুল সবই নেড়েচেড়ে দেখে বলে, 'আবেদ ভাই তোমার বউ বড্ড কালা।'

ঢাকায় এসে দু'জনে সংসার ভালই চলে যাচ্ছিল দু'জনের উপার্জনের টাকায়। একে একে দুটো কন্যাসন্তান জন্ম নিলো । আবেদের এখন আর কাজ করতে মন চায় না। সে ব্যবসা করবে। আবেদকে নিয়ে নাসিমা মামা বাড়ি যায়। মামির কাছে আবেদ ইচ্ছের কথা জানায়। মামা তাকে আরো কয়েক হাজার টাকা দেয়। কিন্তু ব্যবসায় নাকি আরো টাকার প্রয়োজন। নাসিমা তার সন্তানদের জন্য জমানো টাকা সমিতি থেকে তুলে আবেদের হাতে দেয়। আবেদ ব্যবসার জিনিস কিনতে প্রায়ই ঢাকার বাইরে যায়। দু'তিনদিন পর আসে ফিরে। কিন্তু আবেদের ব্যবসার লাভের টাকা নাসিমা দেখে না। নাসিমা চাকরির টাকায় সংসার চালায় কোনমতে। তবে আবেদের ব্যস্ততার অন্ত নেই এখন সে মাসে একদিন দু'দিন এসে ঘরে থাকে। বাকি দিন নাকি সিলেটে থাকতে হয় ব্যবসার কাজে। এরপর একমাস দুইমাস গড়িয়ে যায় আবেদ আসে না। ফোন করলে সহজে ধরে না। বাচ্চাসহ নাসিমা অপেক্ষা করে তার ঘরে ফেরার কিন্তু সে আসে না। লোক মুখে শুনতে পায় আবেদ বিয়ে করে সংসার পেতেছে সিলেটে, নতুন বউ নিয়ে তার বাড়ি জামালপুরেও থেকেছিল কিছুদিন। সে নতুন বউ দূরের কেউ নয় তারই মামাতো বোন শামিমা। শুনে নাসিমা জামালপুর শ্বশুরবাড়িতে ছুটে যায়। তার আসার কথা শুনে আবেদ স্ত্রীকে নিয়ে মামার বাড়ি চলে যায়। নাসিমা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে জানতে চায় বিষয়টা সত্যি কিনা। শ্বশুর চুপ করে থাকে। শাশুড়ি স্বীকার করে তার ছেলে তারই ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করে নতুন সংসার পেতেছে।

নাসিমা সন্তান নিয়ে জামালপুর গ্রামে মুরুব্বিদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে এর বিচারের জন্য। আবেদ তার টাকায় ব্যবসা করে, তার টাকায় গ্রামে ঘর তুলে সে ঘরে তাকে ছেড়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। মুরুব্বিরা সিদ্ধান্ত দেন,' তুমিও এসে বাড়িতে থাকো। তোমার ঘর তোমার দখলেই থাকবে।' কিন্তু কাজ না করলে নাসিমার সংসার চলবে কীভাবে? বাচ্চাগুলোকে এবার স্কুলে পাঠাবে সে। সব ছেড়ে নাসিমা আবার ঢাকায় ফিরে আসে। এবার গার্মেন্টস ছেড়ে বস্তির কাছে হোটেলে কাজ নেয়। কিন্তু তার মন্দ কপালে সুখ সইলো না। এবার থাকার বাসস্থানও আগুনে চলে গেল।

নাসিমা সন্তানসহ গ্রামে এলো তার পালক মামা-মামির কাছে। তারা এখন বৃদ্ধ প্রায়। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। নাতি-নাতনীরা ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। সংসার এখন মামার নিয়ন্ত্রণে নয় মামাত ভাই ও তার বউয়ের নিয়ন্ত্রণে। নাসিমা বুঝতে পারে মামার পুত্র ও তার স্ত্রী এসব উটকো ঝামেলা পছন্দ করে না। তাকেই কিছু একটা করতে হবে।

এ গ্রামটা তার ছোটবেলা থেকে চেনা। এখানে মধুমতি নদীর ঘাটে সকাল বিকাল লঞ্চ চলাচল করে। ঘাটের পাশে পাকা রাস্তা, বাসস্ট্যান্ড, খেলার মাঠ, প্রতিদিন বিকেলে ছেলেরা খেলাধূলা করে, তার পাশে বাজার। সে বাজারের পাশে একটা মাটির চুলা নিয়ে নাসিমা বসে। চা বানিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে। সাথে বিস্কুট আর পাউরুটি। ভালই বিক্রি হতে থাকে। এর কিছুদিন পর একটা ছোট ঝুপড়িঘর তুলে রাস্তার পাশে। সেখানে বসে প্রতিদিন সকালে চা, রুটি, পরোটা, ডিমভাজি, সবজি রান্না করে বিক্রি করতে শুরু করলো। সেটাও ভালো চলতে থাকলো। নাসিমার রান্নার হাত যশ ভালই ছিল বরাবর। সুনাম ছড়িয়ে পড়লো, খাবারের চাহিদা বেড়ে গেল। এরপর নদীর মাছ কিনে কাস্টমারদের জন্য দুপুরের রান্না শুরু করলো। মাছ-মুরগী, সবজি,ডাল ভাত রান্না করে ছোটখাটো হোটেল চালু করে দিলো। তার হোটেলের সুস্বাদু রান্না লোকমুখে প্রশংসিত হতে থাকলে এত লোকের ভিড় ও চাহিদা বেড়ে গেল যে এখন সে নিজে একা আর পারে না। গ্রামের দু'তিনজন বেকার নারীকে সাথে নিলো সহকারী হিসেবে তার সাথে কাজ করার জন্য। তাদেরকে সে বেতন দেয় মাসে। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবারের সাথে এখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় পিঠা নিয়মিত তার হোটেলে বিক্রি হতে থাকলো। হোটেলের পাশে পরিত্যাক্ত জমিটা কিনে নিলো নাসিমা। সেখানে জমির চারপাশে পেঁপে গাছ, কলাগাছ ভিতরে বেগুন, মরিচ, ঢেড়স, টমেটো গাছ লাগিয়ে দিলো। জমির পরিচর্যার জন্য লোক নিলো। তার হোটেলের কাস্টমারদের নিজের গাছের টাটকা শাক-সবজি রান্না করে খাওয়ায়। বাজার থেকে তেমন কিনতে হয় না। টাটকা শাক-সবজি খেতে পেরে তারাও মহাখুশি। লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো নাসিমার হোটেলের খ্যাতি। হোটেলে সামনে সাইনবোর্ড লাগানো হলো তাতে লেখা 'নাসিমা হোটেল'। একনামে সবাই চিনে। মেয়ে দুটিকে নাসিমা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলবে। নাসিমার হোটেলের বড় পরিচয় হলো এ হোটেলের সব কর্মচারী নারী। তার জীবনে পিছনের ফেলে আসা দুর্বিসহ দিনের কথা ভেবে যেন এ গ্রামেরই অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের সহজে ঠাঁই দেয় তার কাছে। স্বাবলম্বী নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সে যেমন নিজে ধন্য তেমনি গ্রামবাসীও তাকে নিয়ে গৌরববোধ করে।

একদিন সকালে এক কাস্টমার এসে নাস্তার টেবিলের এককোনে বসে রয়। এত ব্যস্ত হোটেলে এসে ভিড়ের মাঝে সে একা বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে কোন খাবারের অর্ডার দেয় না। নাসিমার সহকর্মী বিলকিস তার কাছে গিয়ে জানতে চায়, 'কি নাস্তা খাবেন?' সে জানায় কোন খাবার খাবে না। হোটেল মালিকের সাথে দেখা করতে চায়। ব্যাপারটা জেনে ব্যস্ততা কাটিয়ে নাসিমা উঠে আসে কাস্টমারের টেবিলের কাছে। এসে দেখে উসকো-খুসকো চুল, এলোমেলো চাহনিতে আবেদ বসে আছে। তাকে দেখে নাসিমা কথা হারিয়ে ফেলে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না আবেদ আবার তার কাছে ফিরেছে। স্তব্ধ হয়ে ভাবছে এতদিন পর কোথা থেকে এলো! কী চায় সে তার কাছে? তার টাকা,সন্তান নাকি তাকে! বহু কষ্টে সে একাই গড়েছে তার নিজস্ব একটা ভুবন। সেই ভুবনের একলা আকাশে যেন একখণ্ড কালো মেঘ উড়ে এলো।

তুমি রবে নীরবে

ভোরের আকাশটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার মুরুব্বিরা মসজিদ থেকে নামাজ সেরে দলে দলে হালকা আলাপ করতে করতে বাসায় ফিরছেন। কেউ তসবি হাতে দোয়া দরুদ পড়ছেন। কেউ কেউ মৃদু আলাপে মুখরিত। এই সময় রমনা পার্ক বেশ রমরমা। স্বাস্থ্য চর্চাই মূলত প্রধান। একটি বেঞ্চিতে বসে পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা মিসেস সালেহা উল বুনছেন আর মাঝে মাঝে খেয়াল রাখছেন তার দশ বছরের নাতি প্রতীকের দিকে। সে একা একা বল নিয়ে ছুটাছুটি করছে। ঢাকা শহরে বাসার মধ্যে বল খেলবার মতো জায়গা কোথায়? তাই দাদীকে নিয়ে পার্কে আসে। আসলে এ সময়টা দুজনেরই বেশ আনন্দে কাটে। একটা কিক্ করতেই বলটা একটু দূরে গেল। অমনি প্রতীক দৌড়ে আসে দাদির কাছে। হাত ধরে টেনে বলে 'চল না দীদা, ঐ ঝোঁপের পাশে পড়েছে বলটা। নিয়ে আসি।' দূরে একা যাওয়া নিষেধ। কারণ এই পার্কে ছেলেধরাও থাকতে পারে। তা প্রতীকের জানা। দাদী নাতিকে সাথে করে বল নিয়ে আসে। আবার যে যার কাজে ব্যস্ত। বিষয়টা একটু দূর থেকে কৌতূহলবশত পরখ করছিলেন মি. মাসুদ। তাঁরও বেশ ভালো লাগছে বসে বসে এই দৃশ্যটা দেখতে। তিনি একটু একটু করে এগিয়ে এলেন। কাছে এসে বললেন, 'একটু বসতে পারি?'

বসুন। সালেহার অনুমতি না দিয়ে উপায় নেই। কারণ পার্কে বসার বেঞ্চ তো কারো একার দখলে থাকতে পারে না। মিসেস সালেহা যেন একটু লজ্জিত এবং কিছুটা শংকিতও বটে। তবুও,তিনি মিশ্রিত এক হাসি দিয়ে বেঞ্চে বসার অনুমতি দিলেন। মাসুদ সাহেব ধন্যবাদ জানিয়ে বেঞ্চের একপাশে গিয়ে বসলেন। তা এ বুঝি আপনার নাতি?' মাসুদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

জ্বী। ঘোমটা প্রলম্বিত করে জড়োসড়ো হয়ে বসলেন সালেহা। ছেলের ঘরের না মেয়ের ঘরের?

ছেলের।

আমারও দুটো নাতি আছে। ছেলের ঘরের। ভীষণ দুষ্টু। আপনার নাতি ক'জন?

'এই একটিই'। উত্তরে সালেহা বললেন।

সালেহা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নাতিকে বললেন,

'অনেক হয়েছে দাদু ভাই। চল বাসায় যাই। আব্বু-আম্মু চিন্তা করছে।' বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসি'।

'আচ্ছা খোদা হাফেজ।' মাসুদ সাহেব তাদের চলে যাওয়া পথের দিকে মুগ্ধতার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন সকালে মিসেস সালেহা সেই একই বেঞ্চিতে বসে উল বুননিতে মনোযোগ দিলেন আর নাতি খেলা শুরু করে দিলো। এমন সময় পিছন থেকে সালাম এল 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম' বলে ফিরে তাকালেন সালেহা।

আজ কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করে এমনিতেই বেঞ্চের এক পাশে বসলেন জনাব মাসুদ।

'আপনি কি রোজই আসেন এখানে?' মিসেস সালেহা স্বাভাবিকভাবেই আলাপ শুরু করলেন।

জি। ডায়াবেটিস-এর রোগী, ডাক্তারের পরামর্শ। তাছাড়া রিটায়ার্ড লাইফ, সময় কাটানো বড় দায়।'

'তা আপনার স্ত্রী বুঝি খুব ব্যস্ত?' ক্ষণিকের স্তব্ধতা ভাঙলো সালেহার প্রশ্নে। 'জি না, তিনি তো আমাকে ছেড়ে ওপারে চলে গেছেন।'

ব্যথা ভরা শ্বাস ফেলে ষাটোর্ধ্ব এই প্রৌঢ় লোকটির দৃষ্টি প্রসারিত হলো দূর আকাশের দিকে, যেখানে ভেসে বেড়ায় তার সোনালি দিন। মাসুদ সাহেব ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় বিয়ে করেন অভিভাবকদের পছন্দে। কিশোরী মিনারা বেগম নববধূ হয়ে ঘরে এলো। স্বামীকে দেখা মাত্রই কেমন যেন থরথর করে কাঁপতো। শ্বশুরবাড়িতে তার মুখে কোনো ভাষা নেই। ক্ষুধার ইচ্ছে নেই। শুধু চোখ দুটো ভরে থাকতো জলে। বন্দি পাখির মতো কবোষ্ণ বুকে মায়ের জন্য ব্যাকুলতা। দক্ষিণ হাওয়ায় গাছের পাতা দুলে উঠলে বাপের বাড়ির আমবাগের কথা, খেলার সাথীর কথা মনে পড়তো আর ডুকরে ডুকরে কাঁদতো। নানী আইজুন্নেছা বেশ কিছুদিন নাতনীর সাথে তার শ্বশুরবাড়িতে থেকেছেন। একদিন বাবা এলেন পাতিল ভরে নানা রকমের পিঠা পুলি নিয়ে কন্যাকে দেখার জন্য। সেদিন সেই সর্বদা ভীত ও শান্ত কিশোরী বধূর কি যে উচ্ছলতা! কি যে অস্থিরতা! তা আজও স্পষ্ট মনে আছে মাসুদ সাহেবের। মনে হয় সেদিনগুলো বেশি দূরের নয়, এইতো সেদিন। অথচ সময়ের পথ বেয়ে অনেক দিন মাস বছর এবং যুগও পেরিয়ে গেছে।

মিসেস সালেহাও বুঝতে পারলেন যে তার প্রশ্নটা ভদ্রলোকের কষ্ট জাগিয়ে দিয়েছে।

আর সালেহাকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ আমাদের দেশের অন্যান্য মহিলার মতো তার আভরণ দেখে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। পরনে সাদাশাড়ি, সাদাব্লাউজ। নেই কোনো অলংকার। শুধু নাসিকার ছিদ্র পথের নিশানায় জানিয়ে দেয় কোনও এক সময় নাকফুল পরতেন। এই বয়সে মহিলাটির মধ্যে রয়েছে মোহনীয় ভাব। স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। মুগ্ধ হয়ে দেখতেই ইচ্ছে করে। মার্জিত ব্যক্তিত্ব যেন আকর্ষণ বাড়িয়েই দেয়। প্রাক্তন যৌবনে তিনি যে ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, তা তাঁকে এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। তারও কেটেছে এক সময় সংসার ব্যস্ত জীবন। স্বামীর সেবা, বাচ্চা পালন। স্কুল ও অফিসের পোশাক পরিপাটি আছে কি না, তাদের আহার ঠিকমতো তৈরি হয়েছে কি না সংসারের যাবতীয় কাজ করেছেন নিপুণ হাতে। এখন মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। স্বামীসহ বিদেশে থাকে। তাদের নাগরিকত্ব-বাড়ি সেখানেই। চাকরি-বাচ্চা নিয়ে সেখানে তাদের বড় যান্ত্রিক জীবন। মাসে একবার মাকে ফোন করাও যেন সময়ের ব্যাপার। আর ছেলেটা সে দেশে চাকরি করে উচ্চপদে। ছেলে বউ সরকারি বড় অফিসার। তাদেরও ভীষণ ব্যস্ততা। একমাত্র নাতি প্রতীকেরও রয়েছে স্কুল, প্রাইভেট পড়া, কম্পিউটার, টিভি এবং তারপর সময় পেলে দাদীর কাছে আসে। ছেলে ও বৌ-এর বাড়ি ফিরতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়। বিষণ্ন বিকেলে সালেহা একাকী বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুয়ার পরিবেশন করা চা পান করেন আর জীবনের হিসাব মিলাতে থাকেন। কোথায় তার ছেলেবেলা, স্বামী-সোহাগী বঁধু, সংসারী মা এবং আজকের এই বৈধব্য জীবন। একের পর এক সব ঘটনা। এইতো সেদিনের কথা যেন। জীবনটা যেন দ্রুত ফুরিয়ে গেল। তাই প্রতিদিন বিকেলটা তাঁকে উদাসী করে তোলে। শেষ বিকেলে যেন আজানের প্রতীক্ষায় আছেন। জীবন সায়াহ্নে বড় বেশি একা লাগে।

পুরা পার্কটা একবার চক্কর দিয়ে মাসুদ সাহেব সেই বেঞ্চিতে এসে বসলেন। চারদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। বেলা বেশ হয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন ফেরিওয়ালারা পার্কে ভিড় করছে। ধীরে ধীরে ঘেমে উঠছেন তিনি। মাথার উপর মিঠেল রোদটা কেমন যেন ঝাঁঝালো হয়ে উঠছে। সকালে হাঁটতে আসা ভদ্রলোকেরা সব বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। তাদের তো তাড়া আছে কর্তব্যস্থলে যাবার। মাসুদ সাহেবের তেমন কোনও কাজ নেই, তাড়াও নেই। বাড়ি ফিরেই বা কি করবেন। দু'চারটা কথা বলারও কেউ নেই সেখানে। অথচ যখন কেউ ছিল তখন তার সময় ছিল না। ছিল চাকরি, ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। চাকরির প্রয়োজনে বহুদিন বহু জায়গায় মাসুদ সাহেব গিয়েছেন স্ত্রীকে বাসায় রেখে। সেই বালিকাবধূ কখন যে আস্তে আস্তে দায়িত্বশীলা রমণীতে পরিণত হলো। কীভাবে যেন সমস্ত সংসারকার্য সম্পাদন করতেন সুচারুশিল্পীর মতো। তাঁর সংসার আঙিনায় রোপণ করা চারাগাছগুলো আজ ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। তার সাথে মিশে রয়েছে যে পরিশ্রমী ও স্নেহপরায়ণ মালীর অবদান সে আজ নেই সেই সীমানায়।

এ দিকে পার্কে স্কুল-কলেজ পালানো প্রেমিক-প্রেমিকারা আসতে শুরু করেছে। মাসুদ সাহেবের মন চাইছে না বাড়ি ফিরে যেতে। তবুও এখন আর এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। এখন এ পরিবেশে তাকে মানায় না। অবশেষে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে যায় সালেহার মুখ হাত ধুয়ে নাতিটাকেও জাগালেন। পার্কে এসে সেই জায়গায় বসলেন। মনে মনে খুঁজছেন কিছু একটা কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অবশেষে উলের কাজে মনোনিবেশ করেন। কিছুক্ষণ পরপর এদিক সেদিক দেখছেন। আর বার বার ভুল হচ্ছে উলবুনুনিতে। বার বার খুলছেন। একসময় অধৈর্য হয়ে যান, ভাবছেন বাড়ি ফিরে যাবেন। হঠাৎ গাছের ফাঁকে সাদা পাঞ্জাবী যেন দেখতে পেলেন। কোনো এক অজানা আনন্দে তিনি এগিয়ে গেলেন। তিনিও এদিকেই আসছিলেন। সালেহা অভিমানি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন- 'আজ এত দেরি কেন?'

'গত দুইদিন আসা হয়নি কেন?' কৌতূহলি স্বরে বলেন মাসুদ সাহেব। 'বাতের ব্যথাটা বেশ বেড়েছিল।'

তাই নাকি?

মাঝে মাঝে এই ব্যথাটা আমাকে বেশ ভোগায়।

ঔষধ ব্যবহার করেন না?

ছেলেটা এনে দেয়-তবে সে যা ব্যস্ত -ডাক্তারের কাছে যাবার সময় কোথায়? পুরানো ঔষধে তেমন কাজ দিচ্ছে না।

এভাবে দুজনের আলাপ জমে উঠে। জানতে পেল, তারা দুজনই বসবাস করে একই রোডে। মাঝে মাত্র পাচঁ ছটা বিল্ডিং।

তাহলে ঐ লাল সিরামিকের বিল্ডিংটা আপনার?

জি হ্যাঁ-উত্তরে মাসুদ সাহেব জানান।

আপনাদের বাসার সামনে দিয়েই তো রোজ আমাদের আসা যাওয়া। আপনাদের কুকুরটাকে ভীষণ ভয় লাগে-যা গলার আওয়াজ! সালেহার কথায় দুজনেই হেসে উঠে। অনেক দিন পর যেন তারা প্রাণ খুলে হাসছে।

পিছনের ৪০৫ নম্বর বাসাটা আপনার ছেলের?

জি, তবে ওটা ভাড়া বাসা। সালেহা জানায়–

গল্পে গল্পে বেলা যে কত হলো তা কারোরই খেয়াল নেই। অলস অবসর জীবনে তাদের দু'দণ্ড সময় কে দেয়? তাইতো আজ বাড়ি ফেরার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে দুজনই।

সকালের টেবিলে সালেহার ছেলে সোহেল ও বৌ লিলি নাস্তা খেতে বসলো। টেবিলে ছেলে প্রতীক ও শাশুড়িকে না দেখে বুয়াকে ডেকে আনতে বললো। বুয়া জানালো এখনো পার্ক থেকে মর্নিংওয়াক করে ফিরেনি তারা। সোহেল বললো-- 'মার শরীর তাহলে ভালোই আছে। নিয়মিত হাঁটছেন'।

নিয়মিত তিনি শুধু যাচ্ছেনই না। সাথে তোমার ছেলেটাকেও নিচ্ছেন নিয়মিত। আমি বলেছিলাম কাল প্রতীক অনেক রাত জেগেছে, ওকে ভোরে ঘুম থেকে উঠানোর দরকার নেই। একদিন না হয় না-ই গেলেন মর্নিংওয়াকে। তিনি বললেন 'ভোরে উঠলে কোনো ক্ষতি হবে না বরং স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে।' ঠিকই তাকে নিয়ে গেছেন।

আহ্, যাক না বুড়া মানুষ। প্রতীকই তার এক মাত্র সাথী। আমরা তো আমাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাকে সময় দেওয়ার কে আছে বলো? তাছাড়া আমার ধারণা তোমার ছেলেও দাদীর সাথে পার্কে যেতে পছন্দ করে। হি ফিলস্ ইন্টারেস্টেড এন্ড এনজয়স দ্যাট টাইম।

কথাগুলো লিলির খুব একটা পছন্দ হলো না। নিজের কাজে ব্যস্ত হলো আবারো।

ভোরে ঝিরঝির বাতাস বইছে। সামনের আকাশটা নতুন আলোয় উন্মোচিত। সালেহা প্রকৃতির রূপ যেন নতুন করে দেখছেন। পার্কে বসে উল বুনতে আজ আর ভালো লাগছে না। গাছে গাছে তাকিয়ে পাখিগুলোর তৎপরতা দেখছেন। একটু পরে একজন এসে পাশে বসলেন। সালেহা গাছের দিকে তাকিয়েই পাশে বসা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ঐ পাখিটার নাম কি বলুন তো দেখি?'

ভাবছেন পারবো না? ওটা ফিঙ্গে। ছেলেবেলায় কত পাখির বাসা দেখেছি। পাখির বাচ্চা ধরেছি, আদর করেছি। গ্রামের সে দিনগুলো কি মধুর ছিল। বলতে বলতে তিনি এক গভীর ভাবনায় ডুবে যান। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে একটা শিশি - বের করলেন। বললেন--রোজ তিন বেলা দু'ফোঁটা করে খাবেন।

এ আবার কি?

'কাল যে বললেন বাতের ব্যথা। তাই হোমিওপ্যাথি এনেছি। খুব ভালো ডাক্তার। আমার স্ত্রীও উনার ভক্ত ছিলেন।'

আর একটা কি যেন বের করে সালেহার হাতে দিয়ে বললেন-

এটা মালিশ, নিয়মিত লাগাবেন।

পরম মমতা ভরা এ সামগ্রী গ্রহণ করলেন সানন্দে। মনে হলো পৃথিবীতে এখনো একজন আছে, যে তার কথা ভাবে বা তার উপকার করতে চায়।

এই নিরানন্দ পৃথিবীতে যেন সুখের আভাস পেল। ছোট্ট পার্সে সেগুলো ঢুকালেন। আর বললেন-

আমার জন্য কেন এত কষ্ট করলেন? আমিতো বেশ আছি।

'না, আপনি ভালো নেই। বাতের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট, আমি জানি।'

বাসায় ফিরে সালেহা ঐ ঔষধগুলো কোথায় রাখবেন, তার কোনো উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাচ্ছেন না। টেবিলের ড্রয়ারে। সেখানে নাতি বের করে ফেলবে। আলমারিতে। বৌমা যদি জিজ্ঞেস করে কি ঔষধ, কে এনে দিল? তাহলে? এবয়সে কেলেংকারী, রাখবেন কোনখানে। ঔষধগুলো ভালোমতো নেড়েচেড়ে দেখলেন। ওগুলো ব্যবহার করার চেয়ে যেন দেখেই সকল ব্যথা জুড়িয়ে গেল। অবশেষে পার্সে রাখাই নিরাপদ মনে করলেন।

খাবার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'ফোঁটা ঔষধ খেয়ে নিলেন। মালিশ লাগাতে বুয়াকে প্রয়োজন কিন্তু তাতেও নিরাপদ বোধ করলেন না। তাই একাই নিজের মালিশ নিজেই নিলেন। পরমতৃপ্তি অনুভবে সব যন্ত্রণা-কষ্ট ঘুচিয়ে ঘুম এল চোখ জুড়ে।

নাতির পরীক্ষা শেষ। ছেলে এবং বৌমা কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই পরিবারের সকলকে নিয়ে সোহেল কক্সবাজার বেড়াতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ছেলে-বৌ-নাতিসহ সালেহা কক্সবাজার অন্যরকম আমেজে কাটালো কয়েকটা দিন। একটু ভিন্নতার ছোঁয়া ছিল সেখানে। সালেহা সমুদ্রের বালুচরে পানিতে পা ভিজিয়ে নাতির সাথে খেলা করে। মাঝে মাঝে ঝিনুক কুড়ায় দাদু নাতিতে। সোহেল সারাক্ষণ তার স্ত্রীর পাশে পাশে। কখনও হাত ধরে হাঁটে। কখনো পাশাপাশি বসে গল্প করে। এই নিরন্তর অবসর ওদের নতুন করে কাছে টানে। যা কর্মমুখর ঢাকায় কল্পনাও করতে পারে না। পুরাতন ভালোবাসা যেন নতুন সাজে। সোহেল তার স্ত্রীকে বললো-

'আগামী মাসে আমার বিদেশে পোস্টিং হতে পারে। তখন তুমি আর মা ঢাকায় একা কীভাবে থাকবে? বেশ চিন্তায় আছি।'

তা ঠিক, তবে আমি ভাবছি যদি সত্যিই তোমার পোস্টিং হয়, তাহলে আমি রাজশাহী ট্রান্সফার হয়ে যাবো। ওখানে আব্বা মার সাথে গিয়ে থাকবো। প্রতীকও ওখানে ভালোই থাকবে। ভাইয়ার বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারবে। ঢাকায় ওর খেলার তেমন কোনো সাথী নেই ।

কিন্তু সে সমস্যার সমাধান হলেও কিছু ভাবনা রয়ে যায় সালেহাকে নিয়ে। তিনি কি রাজী হবেন বৃদ্ধবয়সে ছেলের শ্বশুরবাড়িতে থাকতে?

ঢাকায় ফিরে যে যার কর্মস্থলে ছুটছে আবার। পূর্বের মতো সালেহা নাতিকে নিয়ে আবার পার্কে এলেন। মাসুদ সাহেব তেমনই একা বসেছিলেন সেই বেঞ্চিতে। সালেহাকে দেখা মাত্রই উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এলেন। কুশল বিনিময় হলো। কেমন ছিলেন, কেমন দেখলেন ইত্যাদি। কথা যেন ফুরোতে চায় না। সালেহা তাঁর পার্স থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে মাসুদ সাহেবের হাতে দিলেন।

'এটা কি?' মাসুদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

পাঞ্জাবীর বোতাম হাতির দাঁতের। কক্সবাজার থেকে আপনার জন্য এনেছি।

মাসুদ সাহেব সাগ্রহে হাতে তুলে নিলেন সে উপহার।

বাসায় ফিরে ভাবছেন কোন পাঞ্জাবীতে লাগাবেন। সবচেয়ে ভালো হয় নতুন কোনো পাঞ্জাবীতে লাগালে। কিন্তু ছেলে বৌ এবং নাতিদেরকে কীভাবে বলবেন নতুন পাঞ্জাবী কেনার কথা। বাসায় তো বেশ কয়েকটা আছে। তাছাড়া নাতি দুটো বড্ড দুষ্টু। দাদার সাথে বেশ ইয়ার্কীও করে আজকাল। বড় নাতিটার মেয়েবন্ধু জুটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। দাদার কাছে জানতে চায় তিনিও প্রেম-ট্রেম করছেন কি না। সে সময়ের প্রেম কি রকম ছিল? এইসব দুষ্টুরা কখন কি কথা বলে বসে-থাক ওসব ঝামেলার দরকার নেই। বরং আসছে ঈদের নতুন পাঞ্জাবীতে লাগাবেন ঠিক করলেন।

দাদার রুমেই দু'ভাই ঘুমায় এক খাটে। অপর খাটে দাদা একা। রাতে মাসুদ সাহেবের ঘুম আসছে না। একটু পরপর উঁকি দিয়ে দেখছেন নাতিরা ঘুমোলো কিনা। ওরা পুরোপুরি ঘুমোলে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলেন। এবার খুবই সন্তর্পনে আলমারিটা খুললেন। পিছু ফিরে আবারও দেখে নিলেন নাতিরা সত্যিই ঘুমোচ্ছে কিনা। বলাতো যায় না, ঘুমের ভান করে দাদার গোপন প্রিয়ার দেওয়া যক্ষের ধন যদি দেখে ফেলে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে আলমারি থেকে প্যাকেটটা বের করলেন।

বোতামগুলো হাতে তুলে দেখলেন। কবে ঈদ আসবে। অত দেরী সহ্য হবে কি? তাই আলমারিতে তুলনামূলক যে পাঞ্জাবী নতুন, সেটাতেই লাগাবেন সিদ্ধান্ত নেন।

খাবার টেবিলে সালেহা প্রথম জানতে পারলেন তার ছেলের বিদেশে বদলীর ব্যাপারটা। ছেলেটা দূরে যাবে, মায়ের মন একটু খারাপ হলো বৈকি। তবুও মা মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে বললেন-

না বাবা, কোনো চিন্তা করিস না। আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। বৌমা আমার লক্ষ্মী, বুদ্ধিমতি মেয়ে। সবই ঠিক মতো সামাল দিতে পারবে।

ঠিকই বলেছেন মা। ও অযথা চিন্তা করছে। রাজশাহীতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ঢাকায় আমাদের দেখার কেউ নেই। ওখানে আব্বা আছেন, ভাইয়া আছেন। আমাদের নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' পুত্রবধূ লিলি এক নিশ্বাসে পুরো সিদ্ধান্তটুকু বলে ফেললো।

রাজশাহী! সালেহা বিস্মিত হলেন।

'হ্যাঁ, মা আমার তো রাজশাহী বদলী হয়েছে। আগামী মাসেই জয়েন করবো। আপনার ছেলেও থাকছে না- আমরা সবাই ওখানে আব্বার বাসায় থাকবো।'

সালেহা স্তম্ভিত। ছেলের বদলী, বৌ-এর বদলী, এত পরিকল্পনা, এত কিছু অথচ তিনি কিছুই জানেন না। ছেলের সংসার আর নিজের সংসারের তফাৎ যেন বুঝতে পারলেন এই প্রথম। এ সংসারে সে যেন করুণার পাত্র মাত্র। কিছুটা অপাংক্তেয়। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীতে মাঝেমাঝে এমনও সময় আসে যখন নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ছেলের শ্বশুরবাড়িতে থাকা তাঁর ব্যক্তিত্বে বড়ই বাধছে। নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। অনেক ভাবনায় দিনরাত কাটিয়ে অবশেষে ছেলেকে বললেন–

'আচ্ছা বাবা, শুনেছি বয়স্কদের থাকার একটা জায়গা নাকি আছে। সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দে না।'

'মা, তুমি কি বলছো! সেখানে তুমি একা একা থাকতে পারবে?'

'একা কোথায়? সেখানে আমাদের সমবয়সীরা সব আছে না। গল্প-গুজব করে বরং সময়টা ভালোই কাটবে।'

মা আমি তো সারাজীবন বিদেশে পরে থাকবো না। দেশে এসে আমরা আবার বাসা নিয়ে একসাথে থাকবো।

তবুও মায়ের পীড়াপীড়িতে ছেলে অবশেষে রাজী হলো, খোঁজ নিয়ে দেখবে।

গাজীপুরের এক বয়স্ক আশ্রমে শেষ পর্যন্ত সোহেল তার মায়ের ভর্তির বন্দোবস্ত করলো। নাম 'অবসর নিবাস'।

সমস্ত পার্কটা যেন আজ ব্যথায় ভরে গিয়েছে। মনের আকাশে দু'জনের ভারী কালোমেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছে। যেন একটু ছোঁয়া লাগলেই অঝোরে ঝরে পড়বে। এই নিরানন্দ একাকী জীবনে যেটুকু সময় তাদের একত্রে কেটেছে-জীবনশক্তি যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বার্ধক্য যে শুধু মানুষকে মরণের পানে টানে-বা এ সময়ে মানুষের একমাত্র কাজ মৃত্যুর অপেক্ষা করা তা-নয়।

এক বিশুদ্ধ ভালোলাগা নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভূতিতে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সাধ বেড়ে গিয়েছিল। কোনও এক নতুন ঠিকানায় নিজেদেরকে আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু আজ বাস্তবতা অন্যরকম। তাঁদের এ অনিবার্য বিচ্ছেদের উপর কারো কোনো হাত নেই। কিছু করারও নেই।

তাই আজ মুখে কোনো কথা নেই। পাখি বা গাছের নাম জানাজানি নেই। শুধু মুখোমুখি বসে থাকা আর ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলা। একসময় বেদনার্ত হৃদয়ে বাসায় ফিরেন দু'জন।

মাসুদ সাহেবের ছেলে ড্রইংরুম জুড়ে পায়চারী করছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না বাবার প্রস্তাবটা। নাতি দু'টো গভীর উদ্বেগের সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। ছেলেবৌ অপরাধীর মতো নিজেকে গুটিয়ে বসে আছে। ছেলে বাবাকে বলল-

বাবা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কেন তুমি আমাদের ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকবে? এখানে তোমার কীসের অসুবিধা? তাছাড়া লোকজনই বা কি বলবে?

'বাবা আমাদের কোনো অপরাধ হলে মাফ করে দিন। তবুও এ সিদ্ধান্ত নিবেন না।' ছেলেবৌ অনুরোধ করে।

না না মা। ছিঃ। তা নয়। তোমরাতো তোমাদের সাধ্যমতো সেবা যত্ন সব কিছুই করছো কিন্তু এ বুড়ো বয়সে ইচ্ছে হয় আমাদের মতো বুড়োদের সাথে গিয়ে থাকি। এই আর কি। তাছাড়া দূরে তো নয়, গাজীপুরের 'অবসর নিবাসে'। সপ্তাহান্তে দেখা তো হবেই।'

গাজীপুর! অবসর নিবাস? ও তুমি কি সব ঠিক করেই এসেছো? ছেলে বললো।

না শুনেছি ওখানে একটা আছে-তাই আর কি।

মাসুদ সাহেবের দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকলেই হার মানলো। বৃদ্ধাশ্রমে তিনি যাবেনই। ছেলে তার বন্ধুর পরিচিত একটা আশ্রমের খোঁজ পেলেন। ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো এবং কাছেও। বাসায় এসে বাবাকে অভিমানী স্বরে জিজ্ঞাস করলো- তাহলে কবে যেতে চাও ওখানে?

আগামী সপ্তাহে। অবসর নিবাসে তো?

না। এটা ওখানকার চেয়েও ভালো এবং কাছেও। এটার নাম 'আনন্দ আশ্রম'। এখানেই সব ঠিক করে এসেছি। মুহূর্তেই মাসুদ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেল। তিনি নীরবে উঠে সোজা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতে পুত্রবধূ খাওয়ার জন্য ডাকতে এলে তিনি বললেন ক্ষিদে নেই, তাই খাবেন না। ছেলেবৌ লক্ষ্য করলো তার শ্বশুরের অন্যকোনো কারণে মন খারাপ, তাই ভাত খেতে চাইছেন না। আর কারণটা বুঝতে কারো বাকী রইলো না। ওই অবসর নিবাসই একমাত্র পছন্দ। সবাই তাঁর অবিচল সিদ্ধান্তে অবাক। কিন্তু ভেবে পেল না কেন এমন হলো। অবসর নিবাসে তিনি যাবেনই। এখানেও তাঁর জিদ। অবশেষে বাবার ইচ্ছেমতো ছেলে ওখানেই বন্দোবস্ত করে এল। বাসায় এসে বাবাকে জানালো 'তোমার পছন্দনীয় জায়গাতে ঠিক করে এলাম।'

মাসুদ সাহেব বড় খুশি আজ। মনটা খুবই ফুরফুরে। কখন রাত পোহাবে। কখন পার্কে যাবেন। সারপ্রাইজটা তাকে দিতে হবেই।

ভোরে পার্কে দেখা হলে সালেহাকে জানাবেন-'আপনার অবসর নিবাসে আমিও বাসিন্দা হতে যাচ্ছি'। সালেহা না জানি কত খুশি হবে। দুজনে একই আশ্রমে! ব্যাপারটা ভেবে ভেবে বারবার পুলকিত হচ্ছেন মাসুদ সাহেব।

এরই মধ্যে দর্জির কাছে গিয়ে পাঞ্জাবীর বোতামগুলো লাগিয়ে এনেছেন। আজ শুভ সংবাদটা ওটা পরেই দিতে যাবেন তিনি।

বহু অপেক্ষার প্রহর কাটিয়ে ভোরের আজান হলো। নামাজ সেরে তিনি হাতির দাঁতের বোতাম লাগানো পাঞ্জাবীটা পরলেন। পার্কের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলেন। সিল্কের পাঞ্জাবীটা মৃদু বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে। তিনি টেনে ঠিক করে নিলেন। বুকের উপর বোতামগুলো ঠিকমতো বসেছে কিনা আবারো চোখ বুলিয়ে নিলেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। ভালোই লাগছে । কি এক মিষ্টি মধুর ছোঁয়ায় দেহ ও মনকে ঘিরে রেখেছে।

বাসা থেকে বের হবার সময় গেটটা ঠিকমতো লাগছিল না সেটা ঠিক করছিলেন। এমন সময় রাস্তায় অনেক লোকের সমাগম। প্রথমে খেয়াল করেননি তিনি। চশমাটা চোখে লাগিয়ে ভালোমতো এবার খেয়াল করলেন। বাসার গেটের সামনে দিয়ে কয়েকজন লোক খাটিয়ায় করে লাশ নিয়ে যাচ্ছে। মুখে গুনগুন করে কালিমা পড়ছে। মাসুদ সাহেবও 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়লেন। হঠাৎ সালেহার নাতি প্রতীককে দেখতে পেলেন। যে ছিল প্রতিদিন তাদের পার্কের সঙ্গী। বিষণ্ন নয়নে প্রতীকও লাশের সাথে সাথে যাচ্ছে। মাসুদ সাহেব বুকের মধ্যে কেমন যেন ধাক্কা খেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন লাশ বহনকারীদের উদ্দেশ্যে-'কার? কি হয়েছিল? কোন বাসার-?'

তাদের মধ্য থেকে একজন জানালো-'গতরাতে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। ওই ৪০৫নং বাসার সোহেল সাহেবের মা।'

সমগ্র পৃথিবীটা যেন মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। তিনি অনুভব করলেন কে যেন হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাতের ছড়িটা রাস্তার মাটিতে পড়ে গেল। পাথরের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন সামনে দিয়ে চলে যাওয়া লাশের দিকে।

চলমান যাত্রীদের কলেমা-দুরুদের গুঞ্জন মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে গেল।

কোহিনুর

স্বাধীনতার পর এটি কেবল শহরে পরিণত হয়েছে মাত্র। শহরের মাঝেই মহিলা সমিতির প্রাইমারি স্কুল চত্বর। টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্কুল বন্ধ থাকায় বেড়ার উপর কেমন তরতর করে বেড়ে উঠেছে স্কুল আয়া করিমনের লাগানো শসাগাছ। কচি কচি শসা ঝুলছে লতায় লতায়। তবে স্কুল খোলা থাকলে এর একটিরও হদিস পাওয়া যেত না।

করিমনের বয়স কত তা ঠাহর করা মুশকিল। সে নিজেও বলতে পারে না। স্বাধীনতাযুদ্ধে তার কপাল ভেঙ্গেছে। স্বামী-সন্তান-সংসার সবই গেছে। তবে সে আইয়ুব আমলে পাক-ভারত যুদ্ধ দেখেছে। মনেও আছে। এ থেকে অনুমান করা চলে যে বয়স হয়তো ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ছোটখাট হাড়গিলা টাইপের মহিলা। মিশমিশে আঁধারের মতো গায়ের রঙ। তবে এখনো কাজকর্মে ভালোই সমর্থ শরীরের চেয়ে বেশি তার মনের জোর। এই ছোট স্কুলঘর ঝাড়ু ও পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর। রাতে একটি ক্লাসরুমের ভিতর সে ঘুমায়।

টিনের গেটের কাছে খুটখুট আওয়াজ। করিমন এগিয়ে আসে, উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে--কেডা?

বাইরে থেকে কোনো উত্তর এল বলে মনে হলো না। কুপি নিয়ে গেটের কাছে যায় করিমন। আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে গেটের তালা খুলতে খুলতে বলে ‘এতক্ষণে তোর আসার সময় হইলো? কই ছিলি পোড়ামুখি? সন্ধ্যে হওনের আগে না আইলে তোরে আর ঢুকতে দিমু না।’ চুপচাপ গুটিশুটি পায়ে একটি পোটলা নিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়

কোহিনুর। সোজা গিয়ে করিমনের চুলার কাছে গিয়ে ধপাস করে বসে। হাতের পোটলাটা লক্ষ করে করিমন। ‘এটা কি? নতুন কাপড় দেহি!পাইলি কই? তোরে একবেলা কেউ পেট ভইরা খাবার দেয় না। কাপড় দিছে কেডা? কেডা তোরে এত দরদ দেখাইলো? বলে কাপড়টা খুলে দেখে।

‘রিলিফের কাপড় দেহি? ও তুই চেয়ারম্যান বাড়ি গেছিলি? তা রিলিফ নাহি শ্যাষ হইয়া গেছে। এহন আইলো কোত্থাইকা?’ কথাগুলো কহিনুরের কানে ঢুকলো কিনা বোঝা গেল না। সে কেবল ঝিম মেরে বসে থাকে। করিমনের রান্না শেষ। চুলোয় পানি ছিঁটিয়ে আগুন নিভায়। হাঁড়িপাতিলগুলো ক্লাসরুমে ঢুকালো। কুপিতে আর বেশি তেল নেই। সলতে টেনে টেনে দিচ্ছে। দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে খাবার শেষ করতে হবে। কোহিনুর বারান্দায় নাক ডাকছে। করিমনের সাথে কোহিনুর পাগলির কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। তবুও সে তাকে মায়ের মতো আগলে রাখতে চায়। হয়ত এই পাগলির মাঝে খুঁজে পায় তার যুদ্ধে হারানো সন্তানদের।

‘ওই উঠ । কোনো সাড়া নাই দেহি। ওই পাগলি উঠ। ভিতরে যা।’

‘ভিতরে যামু না।’

‘হ’ ভিতরে যাবি না। রাইতের বেলায় রাক্ষসেরা তোরে খাবলায় খাবলায় খাইবো। খাইছস কিছু? নে দুগ্‌গা খাইয়া নে।’

কোহিনুর ঘরের ভিতরে ঢুকে ফ্লোরে শুয়ে আবার ঘুমোতে থাকে। করিমন ভাত খেয়ে পাতিলে পানি ঢেলে দেয়। পরদিন পান্তা খাবে। নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে কোহিনুর। লতার মতো তার দেহসৌষ্ঠব। যেন সুচারু ভাস্করের অতি কোমল হাতে সৃষ্টি। দেহের সৌন্দর্য লেপনে সৃষ্টিকর্তা কোথাও কার্পণ্য করেননি। ডাগর ডাগর চোখ মেলে স্কুল বারান্দায় প্রায়ই বসে থাকে। কাউকে কখনো বিরক্ত করে না। একা একা হাসে আবার কখনো বিড়বিড় করে কথা বলে। কখনো বা গান গায়। এত সুন্দর মেয়েটি যে বিকারগ্রস্ত ভাবতে কষ্ট হয়। বিশ্বাসও হয় না। শুধু গায়ের ময়লা গন্ধযুক্ত কাপড় দেখলে মনে হয় হয়তোবা। জনশ্রুতিতে আছে এক অবস্থা সম্পন্ন ঘরের মেয়ে কোহিনুর। বাবার মৃত্যুর পর সৎ মা কি খাইয়ে যেন পাগল বানিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তবে কোথায় তার বাড়িঘর সঠিক কেউ বলতে পারে না। কেউ খুঁজে বের করার চেষ্টাও করে না। নিজের মতো হেঁটে বেড়ায়। ছোট ছোট ইট-পাথর বা নুড়ি পেলে কাঁচুলিতে গুঁজে রাখে। স্কুলের দুষ্টু ছেলে মেয়েরা আমের আঁটি বা কুলের আঁটি তার দিকে ছুঁড়ে মারে। গায়ে ব্যথা না পেলে তেমন ক্ষেপে ওঠে না। মাঝে মাঝে করিমন এসে ওদের ধমক দেয়।

‘অমন করো কেন? আল্লাহ কখন কারে পাগল বানায় কে জানে। পাগলি তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করে না। যাও ক্লাসে যাও। নইলে হেড আপার কাছে নালিশ দিব।’

যদি কেউ অর্ধখাওয়া আইসক্রিম দেখিয়ে বলে একটা গীত গাওতো আইসক্রিম দেবো খেতে। অমনি নিঃশঙ্ক চিত্তে গাইতে শুরু করে। ‘গুর গুর সামেলা সামেলা বংশী বাজায় কে

পোলার মায়ে না মাইয়ার মায়ে আরবি জিবিকে।'

বেসুরো সংগীত। উচ্চস্বরে গলা ফাটিয়ে মাথা দুলিয়ে গাইতে থাকে। কি তার অর্থ তা শুধু সেই জানে। তখনই বোঝা যায় সে পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যরা তা দেখে শুধু আনন্দই পায়।

করিমন কেরোসিন তেল কিনতে আসে বাজারে। মিষ্টি দোকানের কাছে এসে দেখে টেকো দোকানী খালি গায়ে বৃহৎ ভুঁড়ি চুলকাচ্ছে। আর পাগলি কোহিনুরকে দেখে কতকটা আহ্লাদিত কণ্ঠে তার তেঁতুলবিচির মতো দন্ত বিকশিত করে বলছে, 'মিষ্টি খাইবি? এই নে একটা খা। রাইতে রাইতে আহিস পেটভইরা মিষ্টি খাওয়ামু। ভয় নাই। চইলা আহিস কিন্তু। বেবাগডি তোরে দিমুনে।'

কোহিনুর বাসি রসগোল্লা মুখে পুরে পরম তৃপ্তিতে চিবোচ্ছে। পাশ থেকে কথাগুলো করিমনের কানে প্রবেশ করে। সে রেগে ওঠে 'হ রাইতের বেলায় তোর দোকানে 'থু'ফেলতে আইবো। চল পাগলি চল।' পাগলির আশ্রয়দাতা করিমন রাতটুকু তাকে আগলে রাখে। লোলুপদৃষ্টির অভাব নেই। কতদিনই বা রাখতে পারবে কে জানে? কোহিনুর না থাকলে স্কুলগৃহে রাতে সে একাই থাকত। হোক পাগল। তবু সন্ধ্যা হলে করিমন কোহিনুরের আসার অপেক্ষায় থাকে। মাঝরাতে স্কুলঘরে টিনের চালে ঢিল পড়ে। ওমনি করিমন শুষ্ক গলায় খ্যাঁকখেঁকিয়ে চিৎকার দিয়ে বলে 'তুই ঘুমা পাগলি। আয় বজ্জাত, আয়। দা নিয়ে দাঁড়াই আছি। সাহস থাকলে সামনে আয়। দুই টুকরা কইরা ফালামু।'

করিমন পাগলিকে আর স্কুল সীমানা পার হতে দেয় না। বলে--আমার যা জোটে তাই খাবি। আর রাস্তায় বের হোইস না।' পাগলী শুধু ঝিমায় আর ঘুমায়।

চেয়ারম্যান স্কুলকমিটির সভাপতি। স্কুল খুলেছে। অনেক লোকের স্কুলপ্রাঙ্গণে আসা যাওয়া। কোহিনুর পাগলি সম্বন্ধে সকলে যা অনুমান করছিল তাই সঠিক বলে প্রকাশ পায়।

চেয়ারম্যানের এই এলাকায় সুশীল লোকের বাস। সেখানে নষ্টামীর কোনো স্থান নেই। পাগলির বিরুদ্ধে অভিযোগ সে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। পুরুষ লোকদের বিপথগামী করছে। তাই তাঁর এলাকায় সুস্থ-শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পাগলিকে ধরে নেড়ে মাথা করে এই এলাকা থেকে বের করে দিতে হবে। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। লাঠিসোটা নিয়ে লোকজন উপস্থিত। পাগলিকে নিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। হট্টগোল শুনে করিমন ক্লাসরুম ঝাড়ু দেওয়া ফেলে দৌড়ে আসে। দা উঁচিয়ে বৃদ্ধা করিমন সামনে আসে। চেঁচিয়ে বলে-

পাগলি কোন ব্যাটারে নষ্ট করছে? তার প্রমাণ দেন। হ্যারে কে নষ্ট করলো এইডার বিচার কেডা করবো? আগে হেইডা হইবো।'

বৃদ্ধার এমন রুদ্ররুক্ষ মূর্তিতে চেয়ারম্যানের লোকজন কিছুটা থমকে যায়। তবুও হুকুমের দাস লাঠি উঠিয়ে শাসায়-'চুপ কর বুড়ি। কালকের মধ্যে হ্যারে না খেদায় না দিলে বুড়ি তোরও স্কুল চাকরি শ্যাষ।'

ওদের কিল থাপ্পড় লাথি খেয়ে আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা কোহিনুর পাগলী নিথর হয়ে পড়ে থাকে। করিমন তাকে কোনোমতে টেনে স্কুল ঘরে নেয়। সন্ধ্যায় আরো অসুস্থ

হয়ে পড়ে। ব্যথায় কাতরাতে থাকে। করিমন ভাত দেয় সে মুখে নেয় না। ব্যথাটা আরো বৃদ্ধি পায়। সন্ধ্যারাতেই কোহিনুর মৃতসন্তান প্রসব করে। করিমন একাই সবকাজ সম্পন্ন করে। বলে 'কুপিটা নিয়া আস্তে আস্তে আগায় আয় পাগলী। স্কুল ঘরের পিছনের ঝোপে একটা গর্ত করছি। আমার ইচ্ছে হয়- চেয়ারম্যানেরে গিয়া মুখটা দেহায় আনি। চিনেন নাকি এ্যরে।

ভোরের আযানে ঘুম ভেঙ্গে যায় করিমনের। দেখে পাশে কোহিনুর নেই। এদিক সেদিক খোঁজে। স্কুলঘর থেকে বের হয়। এগোয়। কোথাও নেই। এত ভোরে সাধারণত লোকজনের চলাচল শুরু হয় না। তবে দু'তিনজন লোক দ্রুতগতিতে হেঁটে যাচ্ছে চেয়ারম্যান বাড়ির দিকে। আর বলাবলি করছে গতরাতে নাকি চেয়ারম্যান তার কাছারি ঘরে খুন হয়েছে।

করিমন মনে মনে বলে পাপে বাপেরেও ছাড়ে না। আমি যে আরো জানি চেয়ারম্যান নাকি কোহিনুর পাগলীর সৎ মায়ের ভাই। বোনের শ্বশুরবাড়িতে সকল কু-কর্মের চক্রান্তকারী ও সহযোগী। তবে এমনই ধুরন্ধর যে পরবর্তীকালে বোনের সব সম্পত্তিও আত্মসাৎ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সে টাকায় ইলেকশন করে চেয়ারম্যান হয়েছে।

নীরব-নিস্তব্ধ চারদিক। শুধু খল খল খল খল করে খালের পানি বয়ে যাচ্ছে। এখনো প্রভাতের আলো পরিস্ফুট হয়নি। ধোঁয়াসা অস্পষ্ট। খালের অপর পাড়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও খালের দিকেই কে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। করিমন সেদিকেই এগুতে থাকে। কে যেন আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। গন্তব্যহীন এলোমেলো পদক্ষেপে। বাঁশ ধরে ধীরে ধীরে সাঁকোর উপর উঠে যাচ্ছে। সে রুগ্ন অথচ এমন দৃঢ় মনোবল। করিমন চিনতে পারে না কে সে?

প্রত্যুষের আবছা আলো ফুটে ওঠে। করিমন দেখতে পায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লাগানো। রিলিফের সেই শাড়িপরা। সে কি শুধুই একটি পাগলী নাকি একটি নারী একটি মা? সন্তান ও সম্ভ্রম হারানোর প্রতিশোধে পরিতৃপ্ত। যেন সাফল্যের অহংবোধে একটি কোহিনুরের ঐশ্বর্য্য নিয়ে জ্বলছে।

জননী

সকালের রোদ জানালা গলিয়ে বিছানায় ছড়িয়ে পড়লেও পারুর শরীর থেকে রাতের ক্লান্তি আর ঘুমের মাদকতা কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে শরীরের সাথে মনের এক ধরনের প্রতিযোগিতা করেই বিছানা থেকে গাত্র উত্তোলন করলো। কারণ একটু পরেই স্বামী মিনহাজ অফিসের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হবে। তার নাস্তা ও দুপুরের খাবার তৈরি করতে হবে তাকে। আজকাল কি যে হয়েছে! মাথা ঝিম ঝিম করে। সারারাতের মিলিত দু'চোখের পাতাদুটো কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না। শরীরটাকে কিছুতেই বশ মানাতে পারছে না। পা টলমল করে। শুধু নাস্তা তৈরিই নয়, নিজহাতে তাকে পরিবেশনও করতে হবে। কিছুদিন হলো মাছ-মাংস খেতে পারুর কেমন যেন অরুচি লাগে। রান্না করতে গেলেও গন্ধে গা ঘাটা দেয়। কোনোমতে নাক বন্ধ করে রান্না সম্পন্ন করে। কিন্তু রান্নার স্বাদে এদিক ওদিক হলেতো আর রক্ষে নেই। ওমনি মিনহাজের মেজাজ গরম হয়ে যায়-'সারাদিন বাসায় বসে করো কি? রান্নাটাও কি মন লাগায়ে রাঁধতে পারো না'? চেয়ার ধাক্কা দিয়ে ফেলে উঠে চলে যায়। রাগে গটগট করতে করতে মিনহাজ বাসা থেকে বের হয়ে যায়। আর পারুর বিষণ্ন চোখে অপরাধীর ছায়া নেমে আসে। শরীরের এ অবস্থায় ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার কিন্তু কাকে বলবে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কে দিবে ডাক্তারের ফিসের টাকা। পাশের বাসার মুক্তাভাবি একদিন জোর করে বলে, 'ভাবি চলেন আমার সাথে। নইলে একদিন ঘরেই পড়ে মরে থাকবেন'।

গেল ডাক্তারের কাছে। ডা. আনোয়ারা সব পরীক্ষা করে জানালেন শুভ সংবাদ! আপনি মা হতে যাচ্ছেন'। মুক্তাভাবি সেদিন ঘনদুধের পায়েস রান্না করে বিকালে চলে আসেন। বলে ভাবি এখন থেকে রোজ দুধ ডিম ও ভালো খাবার বেশি করে খাবেন ।

সেদিন পারুর সারাদিন অস্থির উত্তেজনায় কাটে। কখন সে বাসায় ফিরবে। নতুন খবর পেয়ে মিনহাজ হয়ত আজ খুশিতে লাফিয়ে উঠবে। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন উপহার দিবে। রাতে ঘড়ির কাঁটায় রাত দশটা, এগারোটা বারোটা পেরিয়ে যায়।

খাবার সাজিয়ে টেবিলে মাথা রেখেই ক্লান্তিতে পারুর ঘুম আসে। আজকাল জানতেও চায় না কেন এত রাত হলো কারণ জিজ্ঞাসা করলেই সে ক্ষেপে যায়।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজে চমকে ওঠে পারু। কারণ ইদানিং একটু শব্দেই বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। এত রাত! তার উপর ঘুমের ঝিমুনি। তাই ডোর ভিউ দিয়ে বার বার দেখে নেয়। দরজা খুলতেই ধমক দিয়ে ওঠে 'খুলতে এত দেরি হয় কেন? সারাদিন শুধু পড়ে পড়ে ঘুমাও না?' মনটা চুপসে যায় পারুর। তবুও আজ যে খুশির দিন। বলতেই হবে শুভ সংবাদটা। খাওয়া শেষে মিনহাজ সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সব গুছিয়ে পারু স্বামীর কাছে আসে। বলে আজ মুক্তাভাবি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল মিনহাজ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করবে 'কেন কি হয়েছিল তোমার?' কিন্তু সে ভাবলেশহীন। 'তবুও গড়গড়িয়ে বলে চলে পারু 'জানো ডাক্তার কি বলেছে? শুনবে না? তুমি বাবা হতে চলেছ। অ্যাই, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? কিছু বলছো না যে।'

'কি বলবো'। মিনহাজের জবাবে মনের কোনে কোথায় যেন নৈঃশব্দে আঁচড় পড়ল। 'তুমি খুশি হও নি?' 'না হবার কি আছে?' স্বামীর সংক্ষিপ্ত নিরুত্তাপ উত্তরে পারু কিছুটা বিস্মিত হলো বৈকি।

এখন আর নিজের রান্না একদম খেতে ইচ্ছে হয় না। মুক্তাভাবি আচার, ভর্তা, শুটকি এটা ওটা এনে খাওয়ায়। ঘরের কাজের জন্য ছোট্ট একটি মেয়েকে ঠিক করে দিয়েছে। কারণ ভারী কাজ করতে ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে। প্রসবের আগে টিটি ইনজেকশন দিতে হবে। মিনহাজকে কথাটা পাড়তেই বলে 'আমার দ্বারা এসব ঝামেলা করা সম্ভব নয়'। মুক্তাভাবিকে নিয়েই পারু নিয়মিত বাসার পাশের মাতৃসদনে যাওয়া আসা করে।

বহু রাতে দরজা খুলে পারু। মিনহাজের মুখে এখন ঝাঁঝালো গন্ধ। তাতেও আক্ষেপ নেই। স্বামীর খাবার পর এঁটো কাঁটা সেরে কোনোমতে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলেই যেন পরম শান্তি। রাতে ওর হাত উঠে আসে স্পর্শকাতর স্থানে। এখন আর পারুর এসব ভালো লাগে না। আস্তে হাত সরিয়ে দেয় পারু। কিন্তু হাতটি আরো শক্ত হয়ে জাপটিয়ে ধরে। কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। পেটের সন্তানের দোহাই দিয়েও শেষ রক্ষা পায় না। নিজের ঘরেই স্বামী কর্তৃক ধর্ষিত হয় এভাবে প্রায় রাতেই।

কাজের মেয়েটি ছোট। তাই পারু নিজে গুড়া সাবানে কাপড় ভিজিয়ে সপ্তাহান্তে ময়লা কাপড়গুলো কাচতে দেয় মেয়েটিকে। মাঝে মাঝে শার্টের সাথে লেগে থাকে লম্বা রং করা চুল। অথচ পারুর চুল তেমন নয়। সাদা কালো চেক শার্ট। যেটা গতবার বিবাহ বার্ষিকীতে পারু তার জমানো টাকা দিয়ে মিনহাজকে উপহার দিয়েছিল। সে শার্টের কলারেও দেখে লাল লিপস্টিকের দাগ। অথচ কতদিন হলো পারু তার শুষ্ক দু'ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায় না। ঘরে দুটো লিপস্টিক ছিল সে কবেকার কেনা। তাও শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। যাহোক এ শরীরে এত বাকবিতর্ক এখন আর ভালো লাগে না। নীরব থাকে। মিনহাজ কিছুদিন হলো সামনের রুমেই ঘুমোয়। রাত জেগে টিভি দেখে। পারুর ঢাউস পেটে সন্তানের নড়াচড়া। শরীরের অস্বস্থিতে ঘুম আসে না

ঠিকমতো। মাঝরাতে পানি পিপাসায় ঘুম ভেঙ্গে যায় । হঠাৎ রান্না ঘরের দরজায় কড়কড় আওয়াজ। পারুর শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। ঠিকইতো, আওয়াজ রান্না ঘরেইতো। সে কি উঠবে। না, ও ঘরের নয়, নিজের ঘরেরই লাইট জ্বালিয়ে দেয়। একটা ছায়া রান্না ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায় সামনের ঘরে। ঘৃণায় ও লজ্জায় গা রিরি করছে। পারু রান্না ঘরে গিয়ে দেখে ছোট্ট কাজের মেয়েটি দরজার পাশে গুটিশুটি হয়ে বসে। ভয়ে কাঁপছে আর ঘামছে। আর কোনো সন্দেহ প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি? তাই কাজের মেয়েটিকে 'দরজায় ভিতর থেকে ছিটকি তুলে ঘুমা' বলে পারু চলে আসে। প্রবৃত্তিতে আসে না ও মুখদর্শন। তবুও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বামী দেবতার ঘরের দিকে যায়। পারুর আসার শব্দে পাশ ফিরে শোয়। পারু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি ঘুমাও নি?'। 'ঘুমিয়েই তো ছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গালেই তখন এক গ্লাস পানি দাওতো'। ইচ্ছে হয় পারুর এক্ষুনি সব ভেঙ্গেচুরে একাকার করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে। তখনই পেটের মধ্যে অনাগত সন্তানটি নড়ে ওঠে। নিজেকে স্থির করে শান্তস্বরে বলে 'নিজে পানি নিয়ে খাও'। চলে আসে ওর ঘরে। আলতো করে হাত বুলায় পেটের উপর 'কবে তুই আসবি? তোকে নিয়ে শুরু করবো নতুন জীবন।'

একদিন সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কোলে আসে তুলতুলে পুত্র সন্তান। তার রোমশ মাথায় হাত বুলিয়ে পুলকিত হয় বারবার। ছোট্ট মুখে স্তন তুলে দিতেই লালগোলাপী ঠোঁটে সে চুকচুক করে খায়। একটু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। অন্যস্তনে ফিনকি দিয়ে দুধ ছোটে। পায়ে টোকা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আবার স্তন তুলে দেয়। খাবার পর ছেলেকে কাঁধে নিয়ে পিঠে হালকা চাপড় দিয়ে ঢেকুর তোলায়। বার বার বিছানা ভিজায়। পাল্টাতে হয় রাতেও কয়েক বার। এভাবেই সময়গুলো কেটে যায় দ্রুত। ছেলেটি বড় হয়ে যায়। মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে পারু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে দিন দিন সন্তানের বেড়ে ওঠা। নাম রেখেছে অপূর্ব। সংক্ষেপে অপু।

অপুকে মা অ আ শেখায়। দ্রুত শিখে ফেলে। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। মাথা ভালো। এবার স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠে। আনন্দে মায়ের বুক ভরে যায়। কোলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় সন্তানকে। অপুর মুক্তাচাচিও তাকে দুপুরে মাংস রান্না করে ভাত খাইয়েছে। বাবা বুঝি আরো সোহাগে কাছে টেনে আদর করবে। অপু রেজাল্ট শিট নিয়ে রাত অবধি অপেক্ষা করে। বহু রাতে তার বাবা আসে ঘরে। সব শুনে বলে এখন শহরের স্কুলে খরচ বেশি। তাই অপুকে ওর নানাবাড়ির স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে। অপু কেঁদে বলে 'আমি যাবো না তোমাদের ছেড়ে।' তবুও একদিন বাবা ওকে নানাবাড়িতে বেড়ানোর নাম করে নিয়ে যায়। সেখানকার স্কুলে ভর্তি করায়। নানা নানি তাকে সাদরে গ্রহণ করে।

নানাবাড়ির স্কুলেও অপু ভালো রেজাল্ট করছে। তবে মাঝে মাঝে শরীর খারাপ করে। জ্বর আসে প্রায়ই। ইদানিং ঘনঘন জ্বর আসে। সংবাদ পেয়ে মা ছুটে ছুটে যায়। নানা চিকিৎসা করছে তাতেও তেমন ফল হচ্ছে না। মুক্তাভাবির পরামর্শে ছেলেকে আবার কাছে নিয়ে আসে পারু। ডাক্তার দেখায়। এটা ওটা পরীক্ষা করতে দেয় ডাক্তার। বহুকষ্টে অর্থ জুগিয়ে সেসব পরীক্ষা করে পারু। কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। অবশেষে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে অপুর লিউকোমিয়া। তবে একবারেই প্রাথমিক স্টেজে সুচিকিৎসায় সুস্থ করা সম্ভব। দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ে পারু। এত টাকা কোথায়

পাবে! কে দিবে? তবে কি মা চেয়ে চেয়ে দেখবে সন্তানের নিশ্চিত মৃত্যু। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র ও সামান্য গহনা বিক্রি করেও অর্থের সংকুলান হয় না।

মুক্তাভাবির ভাই পত্রিকার সাংবাদিক। তিনি পরামর্শ দেন। পত্রিকার পাতায় ছাপানো হয় চিকিৎসার জন্য অপুর ছবিসহ সাহায্যের আবেদন। মিনহাজের সঞ্চয়ী ব্যাংক একাউন্ট দেওয়া হয় সাহায্যের টাকা পাঠাবার জন্য। সাড়া দেয় অনেকেই। কিছুদিন পর তাকে ভারতে নিয়ে যায় চিকিৎসা করাতে। মায়ের চোখে আশার আলো ঝিকঝিকিয়ে ওঠে। অপু সুস্থ হয়ে যাবে। আবার স্কুলে যাবে। আবার বন্ধুদের সাথে বল নিয়ে ছুটাছুটি করবে। তবে এ রকম একবার নয়। আরো কয়েকবার যেতে হবে ভারতে অপুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হলে। প্রতিবারই বিশাল অংকের অর্থ গুনতে হবে।

অপু কিছুটা সুস্থ। তাই এবার বাসার পাশের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় পারু। সে স্কুলে যেতে শুরু করে। খেলার নতুন বন্ধুও জোটে। আবার দ্বিতীয়বার চিকিৎসার জন্য ভারত যাবার সময় হয়ে আসে। কিন্তু বাবা মিনহাজের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। পারু বার বার খুচিয়েও কিছু করতে পারে না। একটা না একটা অজুহাত আছেই। অপুর আবার জ্বর আসতে শুরু করে। পারু বলে 'তোমার জরুরি কাজ থাকেতো ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাবো'। মিনহাজ নিরুত্তর থাকে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে দেখে ঘরের দরজা খোলা। মিনহাজ বাসায় নেই। নেই তার কাপড়-চোপড়। এমন কি নেই ব্যবহার্য কোনো জিনিস পত্রও। কোথায় গেল! খোঁজ করে সর্বত্র। অবশেষে অফিসে গিয়ে জানতে পারে সে অফিস থেকে চাকরি ইস্তফা দিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। নতুন ব্যবসা করবে। পারুর মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে ওঠে। ব্যবসা! এত টাকা কোথায়! ব্যাংকে ছুটে যায়। ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা। সেখানে গিয়ে জানতে পারে দুদিন হলো সব টাকা তুলে নিয়েছে মিনহাজ। এখন উপায়? লোকটির কোথাও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। পালিয়েছে সে। ছেলের চিকিৎসার জন্য সব অর্থ আত্মসাৎ করেছে। পারু আর কোনো কূল কিনারা ভেবে পায় না। এখনো মুক্তাভাবি আগের মতো পাশে এসে দাঁড়ায়। সাহস দিয়ে বলে 'ভেঙ্গে পড়বেন না। আবারো পত্রিকায় সব জানিয়ে সাহায্য চাইবো। এবার পারুর নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলে। টাকা আসতে শুরু করে। কিছু টাকা ব্যাংকে জমলেও তা চিকিৎসার জন্য অপ্রতুল। মা বসে বসে কাঁদে। দিনে দিনে অপু আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুলে আর যায় না। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। তবে কি পারুর নাড়ি ছেড়াঁধন তারই চোখের সামনে দিয়ে এভাবে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে পারু সে ঠিকানায় যোগাযোগ করে।

পারু নিজের একটি কিডনি বিক্রি করে দেয়। কিছু অর্থ পায়। হাসপাতালের বেডে পারু শুয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। কবে সে একটু সুস্থ হবে। কবে সে ছেলেকে নিয়ে যাবে চিকিৎসা করাতে।

অপু সবই বুঝে। মাকে শুধোয় 'মা, তুমিও কি বাবার মতো আমাকে ফেলে চলে যাবে?' মা ছেলেকে জড়িয়ে কাঁদে 'পাগল ছেলে! তা কি হয়? আমি যে তোর মা।'